বাঙ্গালীর বাহুবল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্
মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স

২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী

কালিকা প্রেস

২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

উপহার

দুইটী কথা

এই 'বাঙ্গালীর বাহুবল' বইখানির সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বল্‌বার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে ; কিন্তু বইখানির আগাগোড়া পড়ে আমি দেখ্‌লাম যে, গ্রন্থকার কল্যাণভাজন শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এই বইখানি সম্বন্ধে বল্‌বার বিশেষ কিছু অবকাশ রাখেন নাই ; তিনি অতি সরল, সহজ ভাষায় তাঁর বক্তব্য বিবৃত করেছেন।

বাঙ্গালী যে বাহুবলে হীন ছিল না, এ-কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি ; এ সম্বন্ধে দুই-চারখানি ইতিহাস ও পড়েছি ; কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় আমাদের কিশোর বয়স থেকে আরম্ভ করে, বল্‌তে গেলে, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর এক রকম পাইনি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

বাহুবল বা ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রতি এত অবহেলার কারণ নির্দ্দেশ করতে গেলে বল্‌তে হয় যে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য অত্যধিক আগ্রহে অভিভাবকগণ ছেলেদের শরীর-চর্চ্চার দিকে ততটা—ততটা কেন একেবারেই মন দেন নাই। তার ফলে আমাদের যুবকেরা একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছেন—তাঁরা বাবু হয়ে পড়েছেন। কিছুদিন থেকে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি এ-দিকে পড়েছে ; তাঁরা কলিকাতা সহরের স্কুল ও কলেজের অনেক ছেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এই মত প্রকাশ করেছেন, ছাত্রদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের স্বাস্থ্য ভগ্ন। এর কারণ আর কিছুই নয়—তাঁরা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি মনোযোগী নন ; তাঁরা লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। তার ফলে, তাঁরা হয় ত লেখাপড়া শিখ্‌তে পারেন, কিন্তু কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েন।

ছেলেদের এই রকম লেখাপড়া শেখাবার অত্যধিক ঝোঁক যখন এমন উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তখন আমাদের দেশের ছেলেরা যথারীতি লাঠিখেলা, দৌড়াদৌড়ি, নৌ-চালনা, সাঁতার-কাটা, পদব্রজে ভ্রমণের চর্চ্চায় মন দেবার যথেষ্ট অবকাশ পেতো। সেকালে আমাদের

দেশের জমিদারদের বাড়ীতে শিক্ষিত লাঠিয়াল থাকৃত। জমিদারের ছেলেরা এবং তাঁদের দেখাদেখি গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলা, কুস্তি, সন্তরণ, নৌ-চালনা, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করতেন ; তাঁদের শরীর সে জন্য বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু হোতো।

তার পরই কেমন করে যেন দেশের হাওয়া ফিরে গেল ; ছেলেরা লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাবু হ'তে লাগ্‌ল ; লাঠিখেলা প্রভৃতি যেন ছোটলোকের শিক্ষা ব'লে ধারণা জন্মে গেল। তারই ফলে দেশের এই অধঃপতন—এই পরসাহায্যাপেক্ষা,—এই নিদারুণ অকর্ম্মণ্যতা !

সুখের বিষয়, এখন যেন একটু হাওয়া ফিরেছে, এখন ছেলেদের অভিভাবক ও শিক্ষা-বিভাগের অধিনায়কগণের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছে ; অনেক বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের ব্যবস্থা হয়েছে ; অনেক প্রতিষ্ঠান এই সকল বিষয়ে উৎসাহ দানের আয়োজন করেছেন।

যাঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের মতিগতি এই দিকে ফিরেছে, এই 'বাঙ্গালীর বাহুবল' বইখানিতে শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ তাঁদের জীবন-কথা বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং, এই বইখানি যে সময়োপযোগী হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আমাদের দেশের যুবকেরা এই সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যে অটুট স্বাস্থ্য ও কর্ম্মপটুতা লাভ করে দীর্ঘজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করতে পারেন, এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি।

এই বইখানির ভাষাও বিষয়োপযোগী হয়েছে ; এতে অনাবশ্যক আড়ম্বর বা বর্ণনা নেই ; গ্রন্থকার অতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ত্তমান সময়ের ব্যায়াম-বীরগণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ; কয়েকখানি আলোক-চিত্রের সাহায্যে বক্তব্য বিষয় আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

এই সুন্দর বইখানি যথেষ্ট জনাদর লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীজলধর সেন

বাঙ্গালীর বাহুবল

বিষয়সূচী

বাঙ্গালীর বাহুবল

চিত্রসূচি

বাঙ্গালীর বাহুবল

নব্য ব্যায়ামশালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, শারীরিক বলে বাঙ্গালী কোন দিনই দুর্ব্বল ছিল না। কিন্তু তাহার সাহস ও সংহতি-শক্তি কমিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি, বাঙ্গালী দুর্ব্বল—বাঙ্গালীর এই অপবাদ রটিল কেন? তাহার কারণ ঠিক বুঝা যায় না। অথবা, হয় ত এই অপবাদের মূলে কিছু সত্যও ছিল—মধ্য যুগে বঙ্গ-বাসীর দৈহিক শক্তির হয় ত কিছু অবনতি ঘটিয়াছিল। তাহার কারণও অনুমান করা যাইতে পারে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর এবং ইংরেজ এ দেশের শাসন-ভার স্বহস্তে তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে—ইংরেজের দেওয়ানীর আমলে দেশ অরাজক ছিল বলিলেই হয়। অক্ষম, দুর্ব্বল নবাবের শাসন ছিল না। ইংরেজ রাজস্ব আদায়ের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিত—দেশের শাসন-ব্যাপারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

এইরূপ অরাজক অবস্থায় দেশের সাধারণ লোকদের আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের বাহুবলের উপরই নির্ভর করিতে হইত—চোর-ডাকাতের উপদ্রব নিবারণের জন্য সকলেই বাহুবলের চর্চ্চা করিতে বাধ্য হইত। কাজেই তখন বাঙ্গালী দুর্ব্বল ছিল না, দুর্ব্বল হস্তে লাঠি ধরিত না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

তার পর ইংরেজ এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া লোক-রক্ষার্থ

পুলিশের সৃষ্টি করিলে, দেশের জনসাধারণের আত্মরক্ষার্থ লাঠি ধবিবাব প্রয়োজন রহিল না। সেই সময় হইতেই তাহাদের শরীরচর্চ্চায শৈথিল্য আসিল বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ইহা আমাদের অনুমান মাত্র।

তাহার পর আসিল প্রতিক্রিয়ার যুগ। শরীর-চচ্চার অভাবে আমাদের যে দৈহিক অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে কিছুকাল সময় লাগিয়াছিল। বাঙ্গালী যখন তাহার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল, তখন হইতেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বিশেষতঃ এই সময় ইংরেজ আমাদের সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে আমাদের ছেলেরা স্কুল কলেজে ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, অপব দিকে তাহারা ইংরেজের দেখাদেখি ইংরেজী খেলাধূলা, ইংবেজী ধরণে ব্যায়ামচর্চ্চা কদিতে আরম্ভ কবে। গোড়ায় এ কাজটা কিন্তু সৌখীনভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। উহাতে প্রাণ বা আন্তরিকতা ছিল না।

এই সময়ে আমাদের জাতীয়তা বুদ্ধির উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে। এই স্বাজাত্য-বোধের প্রথম অভিব্যক্তি—হিন্দু-মেলা।

হিন্দু-মেলা একটা বিরাট ব্যাপার। এই হিন্দু-মেলার একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে—সে ইতিহাসের বিশালতাও কম নহে। এখানে তাহার আলোচনার স্থানাভাব, এবং প্রয়োজনাভাবও বটে; কারণ, কেবল শরীর-চর্চ্চা করা হিন্দু-মেলার উদ্দেশ্য ছিল না—হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনই ছিল তাহার প্রধান লক্ষ্য। এবং শরীর-সাধন তাহারই একটা অঙ্গমাত্র ছিল। এই হিন্দুমেলার পরিকল্পনা শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের পক্ষে এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল যে, অনেকেই একেবারে মাতিয়া উঠিলেন; এবং এক এক শ্রেণীর লোক উহার এক একটা দিক লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হিন্দু-মেলাকে কংগ্রেসের সূতিকাগারও

বলা যাইতে পারে। হিন্দুমেলার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা শরীরসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁহার নাম **শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)** তাঁহার পিতার নাম ৺রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায়। গৌরবাবুর জন্ম হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে।

গৌরবাবুর মাতা ছিলেন বিদুষী মহিলা; তাঁহার অনেক সংস্কৃত শাস্ত্র মায় জ্যোতিষ কণ্ঠস্থ ছিল। গৌরবাবুর মাতুল বিখ্যাত পণ্ডিত ৺নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী অনেক বিষয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর (গৌরবাবুর মাতার) সহিত পরামর্শ করিতেন।

গৌরবাবুর মাতা ও মাতুল মহাশয়ের প্রভাবে গৌরবাবুর মনে শৈশবেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, যাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব করিতে হইবে; এবং কতকটা এই বিশ্বাসের দৃঢ়তার ফলেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার খেলাধূলা সমস্ত 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' প্রভৃতি লইয়া। তিনি পাড়ার ছেলেদের জুটাইয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' খেলিতেন। প্রত্যেক দলে ৫০।৬০ জন করিয়া বালক থাকিত এবং তীর ধনুক ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া খেলা হইত। নেপো-লিয়ান বোনাপার্টও সামরিক কলেজে ছাত্রাবস্থায় সহপাঠিদের লইয়া যুদ্ধবিগ্রহের খেলা খেলিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্রের পিস্তুত ভাই ৺অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, জমিদার, একজন বড় পালওয়ান ছিলেন। ইনি হিন্দুমেলায় ১০ জন পাঞ্জাবী জাঠ, পাঠান প্রভৃতিকে এক আসরে উপর্য্যুপরি হারাইয়া ১০ খানা 'মেডেল' পাইয়াছিলেন গৌরবাবু বলেন, ইনিই প্রকৃত শেষ বাঙ্গালী পালওয়ান ছিলেন। আহিরীটোলা ডাল-পটিতে ইঁহার প্রকাণ্ড

বসতবাড়ী পড়িয়া গিয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল ; সেই পোড়ো-বাড়ীটাই গৌরবাবু ও তাঁহার সহযোগিগণের দুর্গস্বরূপ হইয়াছিল ; এবং তথায় তাঁহারা তীর, ধনুক ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া দুর্গ আক্রমণ, অবরোধ প্রভৃতি করিয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন। পাড়ায় অথবা পথে কেহ মাতাল অবস্থায় যাইলে তাঁহারা সদলে তাহার উপর আসিয়া পড়িতেন এবং এইরূপে পানদোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। ক্রমে পাড়ার বয়োবৃদ্ধ দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহাদের দলের রীতিমত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

গৌরবাবু বাল্যকাল হইতেই যাহাকে বলে খুব 'ডানপিটা' তাই ছিলেন ; খেলাধূলা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিতে মত্ত থাকিতেন ; সন্তরণ-বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি উপনয়নের পর দণ্ডি ভাসাই-বার দিনে প্রথম গঙ্গা পার হইয়া যান। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া তিনি প্রায়ই নৌকা ডিঙ্গাইয়া জলে ঝাঁপ দিতেন ; ক্রমে ক্রমে ৩ খানা নৌকা ডিঙ্গাইয়া ঝাঁপ দিতে পারিতেন ; একদা ৪ খানা বড় বড় নৌকা ডিঙ্গাইয়া জলে ঝাঁপ দিতে গিয়া ৩ খানা নৌকা বেশ পার হইয়া গিয়া ৪র্থ নৌকার মাস্তুল জড়াইয়া ধরিয়া ফেলেন।

বেনেটোলার প্রথম জিমন্যাষ্টিক ও কুস্তির আখড়া ছিল ৺বটকৃষ্ণ দত্তর। ইনি গৌরবাবুকে কুস্তি শিখাইতে চাহেন। ৩০ বৎসর বয়স্ক নকুল বসাককে ১৬ বৎসর বয়স্ক গৌরবাবু কুস্তিতে চিৎ করিয়া ফেলেন ; নকুলবাবু কোনমতেই গৌরবাবুকে চিৎ করিতে পারেন না।

হরচন্দ্র লেনের এক আখড়ায় গৌরবাবু কুস্তি শিখাইতে যাইতেন। সেখানে ভুবনমোহন মজুমদার প্যারালাল বারের ব্যায়াম শিখাইতে আসিতেন ও প্রত্যহ গৌরবাবুকে কুস্তিতে আহ্বান করিতেন ; কিন্তু গৌরবাবু ভয় পাইতেন। সেই আখড়ায় প্রত্যহ দুপুরে গৌরবাবু বাঁশ

বাজি, প্যারালাল বার প্রভৃতি অভ্যাস করিতেন। পরিশেষে উক্ত ভুবন মজুমদারের সহিত কুস্তিতে গৌরবাবুরই জয় হয়।

এই আখড়ায় শিখাইতে শিখাইতে গৌরবাবু ক্রমে ২৫।৩০টি আখড়া স্থাপন করেন। গৌরবাবুর তত্ত্বাবধানে আহিরীটোলা ও কলিকাতার বহু পল্লাতে এইরূপ আরও অনেক ব্যায়ামশালা স্থাপিত হইয়াছিল।

গৌরবাবুর নিজের চেষ্টায় এই কলিকাতায় বহুসংখ্যক জিমন্যাষ্টিকের এমেচার আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। তথায় স্কুলের মত নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত রীতিমত ভাবে ছাত্রগণকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রভাব কলিকাতার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার নামে ও তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় ও মফস্বলে এত ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহার নিজের প্রত্যেক স্থানে যাওয়া সম্ভব হইত না। তাই তিনি ব্যায়ামশালাগুলি তাঁহার কতকগুলি সুযোগ্য ছাত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এক একজন ছাত্র কতকগুলি করিয়া ব্যায়াম-শালার ব্যায়ামশিক্ষকরূপে নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিতে যাইতেন। ঐ শিক্ষকগণের চেষ্টায় আবার নূতন নূতন আখড়া স্থাপিত হইত।

ব্যায়ামশালার পরিণতি স্বরূপ ৺প্রিয়নাথ বসু পরে একটি সার্কাসের দল গঠন করেন। কিন্তু ব্যায়ামশালাগুলির সহিত সার্কাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। বরং গৌরবাবু সার্কাস অর্থাৎ পেশাদার জিমন্যাষ্টিকের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ব্যায়ামশালার ছাত্রগণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি গৌরবাবুর প্রখর দৃষ্টি ছিল। প্রিয়নাথ বাবু বলিয়াছিলেন, গুরু গৌরবাবুর আদেশ অমান্য করিয়া তিনি জিমন্যাষ্টিককে পেশাদারী ব্যব-সায়ে পরিণত করায় গৌরবাবু তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তিনি নিজেও বিশেষ লজ্জিত ছিলেন। এমন কি, উত্তরকালেও সেজন্য তিনি গৌরবাবুর নিকট যাইতে লজ্জা বোধ করিতেন।

সিমুলিয়া পল্লীর গোঁসাই কলুকে গৌরবাবু কুস্তিতে হারান। সিমলার ৺প্রিয়নাথ বাবু (গৌরবাবুর অন্যতম প্রিয় বিশেষ কৃতি ও প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং পরে বিখ্যাত বোসের সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ), ভোলানাথ মিশ্র (বাটী সিমলা, নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট), 'আউলচারু' ইঁহারা কয়েকজন জিমন্যাষ্টিক ক্লাব করেন। রাজবল্লভপাড়ার শরৎকুমার সরকার, এটর্ণী এই সিমলার আখড়ায় শিখাইতে আসিতেন। এই সিমলার আখড়া শেষে বিভক্ত হইয়া যায়—ভোলানাথ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে লালচাঁদ মিত্রের বাড়ী আখড়া করেন এবং প্রিয়নাথ সিমলা ষ্ট্রীটে আখড়া লইয়া আসেন।

প্রিয়নাথ বসু

উপরি-উক্ত ৺প্রিয়নাথ বসুর ঐ একটি সিমলার আখড়া হইতে সহর-ময় এবং সহরের বাহিরেও বহু বহু জিমন্যাষ্টিকের আখড়া সৃষ্টি হয়। এবং ঐ সকল আখড়াতে (গৌরবাবু বলেন, মাত্র কলিকাতাতে সিমলা হইতে নেবুতলা পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি আখড়ায়) প্রিয়নাথ নিজে শিক্ষকতা করিতেন। গৌরবাবু বলেন যে, প্রিয়নাথ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর ভিতর Pyramid Act ও Juggling Act অতি সুন্দর করিতে পারিতেন। তা ছাড়া প্যারালাল ও হোরাইজেণ্টাল বার, অশ্বারোহণ প্রভৃতিতেও তাঁহার দক্ষতা থাকিলেও তিনি একজন ভাল ব্যায়ামবীর অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তিনি পালাক্রমে কলিকাতার এতগুলি ক্লাবের সংগঠন ও শিক্ষা কার্য্য চালাইয়া সহরের বাহিরে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহেও (যথা আগড়পাড়া, পানিহাটি প্রভৃতি এবং নিজগ্রাম জাগুলিয়া) ব্যায়ামের জন্য আখড়া স্থাপন করেন। নিজের স্কুলের জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া অথবা মার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল গ্রামে গিয়া ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। প্রিয়নাথ স্বয়ং

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ বসু

বলিতেন যে, তাঁহার সকল ব্যায়ামশালায় নিম্নলিখিত কয়টি সাধারণ নিয়ম ছিল, এবং এইসকল নিয়ম সকলকেই পালন করিতে হইত—

১। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কেহ আখড়ায় যোগ দিবেন না। (বলা বাহুল্য কোনও অভিভাবক অনুমতি না দিলে তিনি নিজে গিয়া উদ্দেশ্য বুঝাইয়া সুঝাইয়া ও অনুনয় বিনয় সহকারে অনুমতি লইবার চেষ্টা করিতেন।)

২। কেহ কোনরূপ নেশার দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না—মায় পান, তামাক ও নস্য পর্য্যন্ত নহে।

৩। কেহ খুব সৌখীন কায়দায় চুলের বাহার করিয়া টেরী কাটিতে পারিবেন না। তবে চুল আঁচড়াইতে পারিবেন। ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হিন্দুমেলা'র অভ্যুদয়কালে ৺নবগোপাল মিত্র, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺মনোমোহন বসু, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়গণের বক্তৃতা, সঙ্গীত ও উদ্যোগের ফলে দেশে যে দেশাত্মবোধ ও স্বাবলম্বনের ভাব প্রথম স্ফুরিত হয়, একরূপ তাহারই প্রত্যক্ষ প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয়নাথ একদিকে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা করিতে থাকেন ও দিকে দিকে অনেক ব্যায়ামশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং তাহার অধ্যক্ষতা করিয়া অতি তরুণ বয়স হইতে এ দেশে ব্যায়াম-শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার করেন। তিনি তাঁহার স্বগ্রাম ছোট জাগুলিয়ায় যে ব্যায়ামের আখড়া স্থাপন করেন, তাহার ছাত্রগণ যে শুধু ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন তাহা নহে; উপরন্তু, জঙ্গল কাটা, খানা পরিষ্কার করা, সেতু নির্ম্মাণ, মড়া ফেলা প্রভৃতি বিবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতেন।

হিন্দু-মেলার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলস্বরূপ "ন্যাশনাল" (National) কথাটির এই সময়ে খুব প্রচার ও ব্যবহার হইতে থাকে। তখন

নবগোপাল মিত্র National Gymnastic Club স্থাপন করেন। অন্য দিকে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়; স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন দে National Magazine বাহির করিতে আরম্ভ করেন; এবং চারিদিকে Nationalএর ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়। অপর দিকে হিন্দু মেলায় ৺মনোমোহন বসু গানে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে কেবলই প্রচার করিতে থাকেন যে, "স্বাবলম্বন ভিন্ন অন্য পথ নাই"; "শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিলে ভীরুতা আসিবেই" ইত্যাদি।

ইহার পর সামান্য জিমন্যাষ্টিকের আখড়া হইতে প্রিয়নাথ কিরূপে জগদ্বিখ্যাত বোসের সার্কাস স্থাপন করেন এবং Harmston, Feitzarts প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ও শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয় কোম্পানীর সহিত সমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিরূপ অর্থ উপার্জ্জন এবং স্বজাতি-বিক্রমের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন—তাহা স্বতন্ত্র ইতিহাসের বিষয়।

এই সার্কাসেই ৺প্রিয়নাথের হাতে গড়া প্রিয় শিষ্য পবনচাঁদের ট্রাপিজ ক্রীড়া দেখিয়া Colonel Fendal Currie লিখিয়াছিলেন,— "I have never seen anything better in England than Bir Pavan Chand on the High Trapeze. পুনশ্চ—Offg. Colonel on the staff, H. M. Evans, Rawalpindi লিখিয়াছেন,—The Trapeze feats are better than I have seen anywhere.

অর্থাৎ কর্ণেল ফেণ্ডাল ক্যুরি লিখিয়াছেন,—উচ্চ ট্রাপিজের উপর বীর পবনচাঁদ যে খেলা দেখাইয়াছিলেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খেলা আমি ইংল্যাণ্ডেও দেখি নাই। এবং রাওয়ালপিণ্ডিস্থিত, সমরবিভাগীয় কর্ণেল এইচ, এম, এভান্স লিখিয়াছিলেন,—আমি যত ট্রাপিজের খেলা দেখিয়াছি, ইহা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

সীমান্তের Tirah Expeditionary force-এর Commander বীর Sir A. P. Palmer K. C. B., C. S., প্রিয়নাথের নবগঠিত সার্কাসে বাঙ্গালীর শৌর্য্য ও বীর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

"I had no idea that the vaulting ambition of young Bengal aspired so high."

অর্থাৎ টিরা অভিযানকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ স্যার এ, পি, পামার সাহেব বলিয়াছিলেন,—ব্যায়াম-ক্রীড়ার ক্ষেত্রে তরুণ বঙ্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে এতখানি উচ্চ এরূপ ধারণা আমার ছিল না।

এইরূপে এক দিকে হিমালয় হইতে কুমারিকা, অপর দিকে ব্রহ্ম হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত, বহু স্বাধীন ভূপতি, রাজা মহারাজা, করদ এবং মিত্র-রাজের ও অপর দিকে, ভাইসরয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কমিশনার, প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির বহু প্রশংসা-পত্র দেখিলে—আমরা বাঙ্গালী, আমাদের বক্ষ গর্ব্বে স্ফীত হয় যে—যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, রসায়ন, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আজ বিশ্ব-বরেণ্য, তেমনই ব্যায়াম বিষয়েও বাঙ্গালী যে উন্নতি দেখাইয়াছে তাহাও কম নহে।

প্রিয়নাথের উল্লিখিত সিমুলিয়ার ব্যায়ামশালায় দেশপূজ্য ৺বিবেকানন্দও মাঝে মাঝে ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। তাঁহারও ঐ এক পাড়ায় বাড়ী ছিল এবং প্রিয়নাথ ও তাঁহার অগ্রজ ৺মতিলালের সহিত তিনি সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর জীবনে এই Bose's Circus-কে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—He was doing greater work than perhaps any Bengalee worker in setting an example in organisation and proving Bengalee nerve and pluck."

অর্থাৎ, তিনি (প্রিয়নাথ) সুশৃঙ্খল সংগঠন-শক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন

করিয়া এবং বাঙ্গালীর সাহস ও বীর্য্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া অন্যান্য বাঙ্গালী কর্ম্মীর অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতেছেন।

শরীর-সাধন-ক্ষেত্র

শরীর-সাধনের ক্ষেত্র নানা প্রকার ; এমন কি, অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা এখানে মোটামুটি কয়েক প্রকার শরীর-সাধন-ক্ষেত্রের উল্লেখ করিতেছি—

১। কুস্তি (wrestling)।
২। ব্যায়াম বা জিমন্যাষ্টিক (gymnastic)।
৩। ভার-উত্তোলন (weight-lifting)।
৪। সন্তরণ (swimming)।
৫। অশ্বারোহণ (riding)।
৬। পদব্রজে ভ্রমণ (brisk walking)।
৭। লাঠিখেলা।
৮। তরবারি খেলা (fencing)।
৯। ফুটবল (football)।
১০। ক্রিকেট (cricket)।
১১। মুষ্টি-যুদ্ধ (boxing)।
১২। টেনিস (tennis)।
১৩। সাইক্লিং (cycling)।
১৪। হকি (hockey)।
১৫। লক্ষ্যবেধ (archery) বা ধনুর্বিদ্যা।
১৬। শিকার (hunting)।
১৭। সার্কাস (circus)।

১৮। অসমসাহসিকতা (daring feat)।

১৯। বিমান-বিহার (flying)।

২০। গোলা-নিক্ষেপ (heavy ball throwing)।

২১। পেশী-সঙ্কোচন (muscle control)।

২২। কপাটি প্রভৃতি।

২৩। সৈনিক-বৃত্তি।

২৪। Athletic sports.

২৫। Tug of war.

এতদ্ব্যতীত আরও নানা বিষয়ের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। আপাততঃ আলোচনার পক্ষে এইগুলি যথেষ্ট। ইহাদের মধ্যে ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫, ১৬, ২২ ও ২৩ সংখ্যক শরীর-সাধন-পদ্ধতি ভারতের, তথা বঙ্গদেশের নিজস্ব এবং বহু কাল হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে। অপরগুলি বিদেশীয়। কিন্তু কি দেশীয়, কি বিদেশীয়-শরীর-সাধনের কোন ক্ষেত্রেই যে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ নহে, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিব। এই সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা যে কেবল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই নহে ; এমন কি, বিদেশীয় শরীর-সাধন ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা বিদেশীদেরও পরাজিত করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

কুস্তিগীর পালোয়ান

ব্যায়াম-চর্চ্চার কথা কহিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিজস্ব দেশীয় ব্যায়ামকুশলী কুস্তিগীর পালোয়ানদের কথাই মনে পড়ে। কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ নিতান্তই আমাদের দেশের নিজস্ব জিনিস ; এবং কেবল আমাদের দেশের কেন, উহা প্রাচ্য দেশের বিশিষ্ট ব্যায়াম বলিলেও চলে। মধ্যম পাণ্ডব ভীম অদ্বিতীয় মল্ল ছিলেন। সোরাব ও রোস্তম—পিতা ও পুত্র পারস্যের বিখ্যাত মল্ল। চীন ও জাপানেও বহু প্রচণ্ড বলশালী মল্ল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা ইয়োরোপে এবং আমেরিকাতেও মল্ল যুদ্ধের প্রচলন হইয়াছে।

বঙ্গভূমিতে বহু মল্লবীরের আবির্ভাব হইয়াছে ; এখনও বাঙ্গালায় অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান বর্ত্তমান আছেন। বাঙ্গালার এক অংশের প্রাচীন নাম ছিল মল্লভূমি। ইহা হইতে অনুমান হয়, সেখানে এককালে বহু সংখ্যক মল্লবীরের বাস ছিল। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানেও মল্লবীরের অভাব নাই।

ইদানীং বাঙ্গালী মল্লদিগের মধ্যে অনেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শরীর-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি স্থানের অনেক মল্লবীরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সেই শান্তিপুরের গোস্বামী বংশোদ্ভুত একজন ব্যায়ামবীর অধুনা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি—

ব্যায়ামাচার্য্য ডাক্তার শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

আচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার শরীর-সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বিবরণ চাহিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি

নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ প্রদান করিয়া এবং চিত্রগুলি প্রদান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আচার্য্য গোস্বামী মহাশয় ২৫এ আশ্বিন, ১২৯৮ (১১ই অক্টোবর, ১৮৯১), বীরাষ্টমীর দিবসে নদীয়া, শান্তিপুরে উড়িষ্যা গোস্বামী-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বজন-সম্মানিত, কৃতী, কীর্ত্তিমান উড়িষ্যা গোস্বামী-বংশ-সম্ভূত। তাঁহার পিতা, গোস্বামী ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী স্বজাতির কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যে আদর্শ স্থাপনার্থ নিজের পুত্রগণকে কি ভাবে শিক্ষিত করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত অভিমত দুইটি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

"I feel indebted to you for the life-long interest you have taken for the betterment of the whole of our race."

"I really take you to be a piller of support to the cause of Indian Physical Culture. I must congratulate you for the worthy children you have built."

—*Editor*, *Athletic India.*

"He was grieved to notice the gradual physical deterioration of his race and was determined, like a good father, to give his sons an all-round education, mental as well as physical.

" * * * But think of it—how the versible ideas were rewarded. For, today we find that the eldest of the sons, Shyamsundar has gradually developed himself as the present world-champion in weight-supporting. Indeed, he, in short, claims to be the strongest man on earth in that particular feat of strength."

—"Sad Neglect of Physical Culture among the Indians" by Piyush Kanti Ghosh.

অর্থাৎ, "আমাদের জাতির উন্নতি সাধনের জন্য আপনি যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।"

"আমি আপনাকে ভারতীয় শারীরচর্চ্চা-প্রচেষ্টার নির্ভর-স্থল বিবেচনা করি। আপনি যে ভাবে আপনার সন্তানগুলিকে তৈয়ার করিয়াছেন, সেজন্য আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"

সম্পাদক—এ্যাথলেটিক ইণ্ডিয়া।

"ক্রমশঃ তাঁহার জাতির দৈহিক অধঃপতন দেখিয়া তিনি দুঃখিত হন, এবং উপযুক্ত পিতার ন্যায় তাঁহার সন্তানগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে কৃতসঙ্কল্প হন।

" * * * কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ কল্পনা কি ভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কারণ, আজ আমরা দেখিতেছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর ক্রমে তাঁহার শারীরিক এতটা উন্নতিসাধন করিয়াছেন যে, ভার-সহন-ক্ষমতায় তিনি আজ পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। বস্তুতঃ, তিনি বলেন, ভার-সহন ক্ষমতায় তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ব্যক্তি।"—পীযূষকান্তি ঘোষ প্রণীত "ভারতবাসীদের শরীরচর্চ্চায় অবহেলা"।

শ্যামসুন্দরের জননী পুণ্যশীলা শ্রীযুক্তা সুরেশ্বরী দেবী যথার্থই বীর-প্রসবিনী।

শৈশবে শ্যামসুন্দরের মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব দেখা যায় নাই। সাধারণ বাঙ্গালী শিশুর ন্যায় শ্যামসুন্দরও শৈশবে ভগ্নস্বাস্থ্য, রুগ্নদেহ, ক্ষীণকায় ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া পিতা স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এবং সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বপ্রযত্নে পুত্রের শরীর-সাধনার দিকে মনোনিবেশ করেন। যিনি জাতির শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখিয়া ব্যথিত, এবং জাতির দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া

স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে যত্নশীল, তিনি যে সর্ব্বাগ্রে নিজ পুত্রের রুগ্ন দেহের উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহার সহিত পুত্রের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও বিরাট কল্পনা মিলিত হইয়া মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইল। শৈশবেই শ্যামসুন্দর পিতার নিকট হইতে "মানুষ হইবার" মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। শরীর সাধনা—অপরিমেয় শক্তিলাভই সেই মন্ত্র। সেই সাধনার ফলেই আজ তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক শরীর-সাধন-ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ব্যায়ামকুশলী বলিয়া পরিগণিত। সেই সাধনা তাঁহার তথ্য নির্ণয়ের অক্লান্ত চেষ্টা, অবিচলিত অধ্যবসায়, গভীর গবেষণা, তুলনামূলক তত্ত্বানুসন্ধান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সিদ্ধান্ত-সমূহের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও পরীক্ষা, ধীর পর্য্যবেক্ষণ, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক বিচার সঞ্জাত। এক কথায়, তিনি শরীর-সাধন ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থাপন করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা দেশের বাহিরের বহু ইংরেজী, বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় লিখিত বহু প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়। তাঁহার মৌলিক গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তগুলি সুদূর আমেরিকাতেও অনুমোদিত ও সমাদৃত হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার গোস্বামী আমেরিকার Naturopathic সমিতির সদস্য। এই বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি Doctor of Naturopathy (N. D.) উপাধি ভূষিত হইয়াছেন।

ডাক্তার গোস্বামী মহীশূরের মহারাজা, নরসিংহগড়ের মহারাজা, মহারাজা কিষেণপ্রসাদ বাহাদুর প্রভৃতি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ রাজন্যবৃন্দের সমক্ষে তাঁহার অনন্যসাধারণ শারীরিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বহুমূল্য উপহার লাভ করিয়াছেন। পিঠাপুরমের মহারাজা তাঁহাকে

হীরকখচিত পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। নিজাম ক্লাব তাঁহাকে Iron Man (লৌহ-মনুষ্য) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

তদ্ব্যতীত, গোস্বামী মহাশয় নেপালের মহারাজা, পিঠাপুরমের মহারাজা, রামনাদের রাজা, নবাব স্থালার জঙ্গ বাহাদুর, পারলাকিমেডির রাজকুমার প্রভৃতির ব্যায়ামশিক্ষক ছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞান-সম্মত ব্যায়ামবিদ্যা প্রচলনের জন্য ইউজিন স্যাণ্ডো যেমন পথ-প্রদর্শক রূপে পরিগণিত, সেইরূপ, আমাদের দেশে শ্যামসুন্দর গোস্বামী প্রসিদ্ধ গোস্বামী-পদ্ধতির (Goswami method of Training and Treatment) প্রবর্ত্তক। তিনি যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্তর্ধৌতি ও বস্তি প্রথার আবিষ্কর্ত্তা। ইনিই নিখিল ভারত মল্ল-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্যায়ামচর্চ্চা ও শরীর সাধন দ্বারা বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ডাক্তার গোস্বামী কিরূপ অমানুষিক শক্তি লাভ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—যে শক্তিতে আমি বক্ষের উপর ছয় টন ওজনের রোলার এবং দুইটী হস্তীর ভার এবং কণ্ঠদেশে অর্দ্ধ টন ভার সহ্য করিতে পারি, যে শক্তির বলে—অতি বলবান লোক লোহার সাঁড়াশী দিয়া চিম্‌টি কাটিলেও আমার মাংসপেশী একটুও সঙ্কুচিত হয় না, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুষ্টিযোদ্ধা আমার উদরদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিলেও যে শক্তির প্রভাবে আমি অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে পারি, যে শক্তিতে আমার কণ্ঠদেশের মাংসপেশীগুলি এমন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে আটজন বলবান লোক সবলে আমার গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিতে পারে না, আমার দেহের উপর দিয়া বোঝাই সহ মোটর লরী চলিয়া গেলেও যে শক্তির প্রভাবে আমি কাতর হই না, যে শক্তি বলে আমি এমন ক্ষমতা
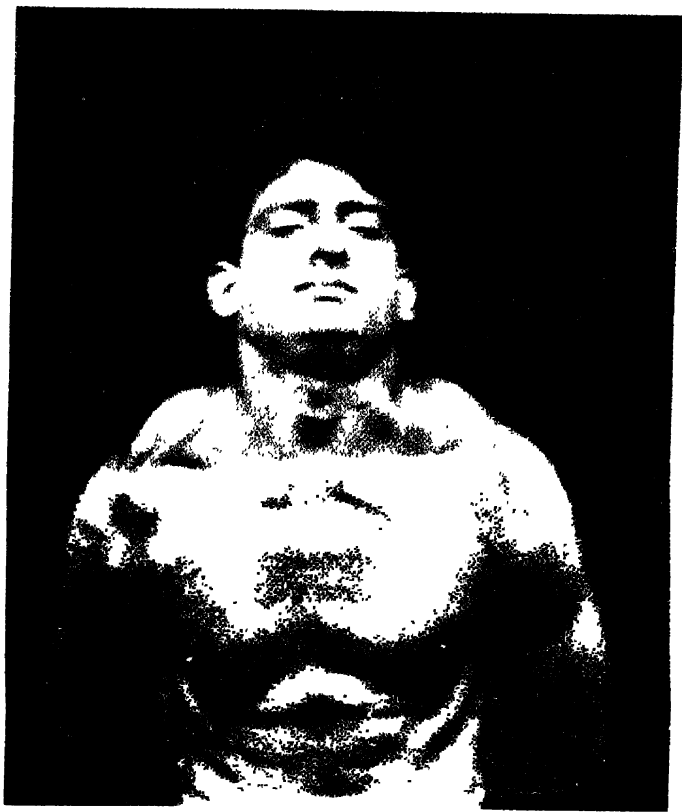
শ্রীযুক্ত নিতাইসুন্দর গোস্বামী

লাভ করিয়াছি যে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে দ্বাদশ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিলেও আমার স্নায়ুমণ্ডলীর কোন ক্ষতি হয় না, সেই শক্তির ক্রিয়া আমার অতি প্রিয় ক্রীড়া মাত্র।

তা ছাড়া, দশজন বাছা বাছা গোরা সৈন্য তাঁহার গলায় কাছি বাঁধিয়া দুই দিক হইতে টানিয়া তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকা তাঁহার গলার উপর দিয়া চালানো হয়। তিনি একসঙ্গে তিন প্যাকেট তাস ছিঁড়িতে পারেন। তিনি এক প্যাকেট তাসকে অর্দ্ধভাগ, সিকি ভাগ, এইরূপে ক্রমান্বয়ে $\frac{১}{৬৪}$ ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন।

শরীরের নাম মহাশয়
যা সওয়াও তাই সয়।

শরীর-সাধনা করিলে শরীরের দ্বারা অসাধ্য-সাধনও করানো যায়। একসঙ্গে এবং সুসমঞ্জসভাবে শরীর ও মস্তিষ্কের সাধনা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাংসপেশীগুলি সঞ্চালিত হয়, এবং স্বাস্থ্যবিধিসঙ্গত ভাবে সর্ব্বাঙ্গের চালনা হয়। এইভাবে কার্য্য করিলে শরীরকে এমনভাবে তৈয়ার করা যাইতে পারে যাহাতে তাহার দ্বারা অতি বিস্ময়কর কার্য্যসমূহ করানো যাইতে পারে। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের শক্তিও অসাধারণভাবে বর্দ্ধিত করা যায়।

ডাক্তার গোস্বামীর শরীর সাধনার উদ্দেশ্য জাতি-গঠন এবং জাতিগত-ভাবে সমগ্র দেশবাসীর দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধান। এতদর্থে জাতিগতভাবে স্বাস্থ্য ও শক্তির অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য গোস্বামী মহাশয় Goswami's Institute of Research and Advancement of Physical Culture নামক একটি বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামশালা স্থাপন করিয়াছেন। কারণ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ও

অবিচলিত ধারণা—প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ স্বাস্থ্য এবং শারীর-মানস উভয়বিধ যোগ্যতাই জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির মূল—নিমিত্তও বটে, উপাদানও বটে।

শ্যামসুন্দর বাবুরা তিন সহোদর। শ্যামসুন্দরই জ্যেষ্ঠ। মধ্যম গৌরসুন্দর ধনুর্বিদ্যাবিশারদ; আর পেশী-নিয়ন্ত্রণ-কলাকুশল (muscle control artist) নিতাইসুন্দর কনিষ্ঠ। শ্যামসুন্দরের দুই ভগিনীও ব্যায়ামকুশলা। তাঁহার ছাত্রী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী ব্যায়াম করিয়া সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী হইয়াছেন। এই গোস্বামী পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা ব্যায়াম-চর্চ্চায় নিরত। এইজন্য শ্যামসুন্দরের পিতৃদেব The Patriarch of a Physical Culturist Family বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন।

শ্যামসুন্দর বাবুরা তিন ভ্রাতাই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী। শ্যামসুন্দরের এই অসাধারণ বল, বীর্য্য, মেধা, স্বাস্থ্য তাঁহার আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং দ্বাদশবর্ষব্যাপী শরীর-সাধনার সুমহৎ পরিণাম। এ পক্ষে শ্যামসুন্দরের মাতা-পিতা কখনও পুত্রকে বাধা দেন নাই, বরং বরাবরই উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালায় এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

শ্যামসুন্দরবাবু অধুনা শরীর-সাধনা সংক্রান্ত গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মানব-দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বিধান, সুসমঞ্জসভাবে (symmetrically) দেহ গঠন, আয়ুর্বর্দ্ধন, জরা-ব্যাধি নিবারণ, বল-মেধা বৃদ্ধি, বিন্দু-ধারণ, স্বাস্থ্যনীতির সুযুক্তিসম্মত ভাবে প্রয়োগ, শরীর-মনের সম্বন্ধ বিচার, সবল সুন্দর, স্বাস্থ্যবান অপত্যোৎপাদনোপায় নির্দ্ধারণ, যোগানুগত লুপ্ত স্বাস্থ্যসাধন-পদ্ধতির পুনরুদ্ধার, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রীতির সমন্বয় সাধন প্রভৃতি জাতি গঠনোপযোগী (nation building) বিষয়সমূহ তাঁহার গবেষণার বিষয় ও পরীক্ষাধীন। পরীক্ষা শেষ হইলে তাহার ফলাফল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

(শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী মহাশয়ের ছাত্রী) ১৮

এই গোস্বামী-পরিবারের মূল মন্ত্র—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।"

অসুস্থ, দুর্ব্বল দেহ, আর উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন, নিরুদ্যম, নিস্পন্দ, অসাড়, মৃতকল্প মন আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কারণ। ইহাই ইঁহাদের বদ্ধমূল সংস্কার, অবিচলিত বিশ্বাস। আর এই সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার নিরাকরণ-কল্পে ইঁহাদের সকল প্রয়াস।

প্রোফেসর গোস্বামীর শক্তিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ইঁহাকে "ব্যায়াম-বিদ্যা-বাচস্পতি" এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ইঁহাকে "ব্যায়াম-যোগপঞ্চানন" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

কান্ত-বলী শ্যামাকান্ত

বিক্রমপুরের বীর-বিক্রম শ্যামাকান্তের বীর-কীর্ত্তিতে গৌরব বোধ না করেন, বাঙ্গালা দেশে এমন বাঙ্গালী কে আছেন? শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর "বাবু"ত্বের আমলে, যখন বলব্যঞ্জক শরীরচর্চ্চা "ছোটলোকে"র পেশা বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই সময়ে শ্যামাকান্ত শরীরচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া উহার পুনরুদ্ধার সাধন করেন। এক সময়ে বেদ এ দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পৌরাণিক যুগে সুরাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্র-মন্থন করিয়া বেদের উদ্ধার সাধন করেন। রায়বেঁশে বীরত্ব ও বলব্যঞ্জক নৃত্য; কিন্তু তাহা নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। অধুনা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অনেক চেষ্টায় উহাকে ভদ্রশ্রেণীর গ্রাহ্য করিবার আয়োজন করিতেছেন। শ্যামাকান্তও তদ্রূপ বাঙ্গালায় শরীরচর্চ্চার অন্ধকার যুগে মহোদ্যমে শরীরচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া ব্যায়ামচর্চ্চাকে ভদ্রশ্রেণী-গ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন।

সেই বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্ত বাঙ্গালা ১২৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়ল গ্রামে ফুলিয়া মেলের মহাকুলীন বন্দ্যঘটি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাকান্তের পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার জজ আদালতে সেরিস্তাদারের কর্ম্ম করিতেন।

তখনও বাঙ্গালী জাতি ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হইয়া যায় নাই। তখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সুস্থ, সবল ব্যক্তিরা বর্ত্তমান ছিলেন। তখনকার বাঙ্গালীর ঘরে হৃষ্টপুষ্ট বলবান শিশুরাই জন্মগ্রহণ করিত। শশিভূষণের চারিটি পুত্র ও তিনটি কন্যাই সুস্থ ও সবল ছিল। তন্মধ্যে শ্যামাকান্ত শরীরচর্চ্চা করিয়া অসাধারণ বল সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই শ্যামাকান্ত ব্যায়ামে মনোনিবেশ করেন। পরিণত বয়সে যাঁহারা বাহুবলে বলীয়ান হইয়া উঠেন, শৈশবে লেখাপড়া অপেক্ষা শরীরচর্চ্চার দিকেই তাঁহাদের মনোযোগ বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। শ্যামাকান্তের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ঢাকায় গিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পর তিনি লেখাপড়া যত করুন আর নাই করুন, ব্যায়ামচর্চ্চায় বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। স্কুলের ব্যায়ামশালায় নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। সেইজন্য তিনি একটি আখড়ায় কুস্তি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঢাকায় কুস্তির চর্চ্চা বিলক্ষণ ছিল—অনেক বড় বড় পালোয়ানও ছিলেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে শ্যামাকান্ত অল্পকাল মধ্যে কুস্তির কৌশল সকল এমন আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন যে, দেশ-বিদেশ হইতে আগত বহু নামজাদা পালোয়ানকে তিনি শিক্ষানবীশ অবস্থাতেই পরাজিত করিয়াছিলেন। সেকালে পণ্ডিত সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। তাঁহারা যখন যেখানে যাইতেন, সেইখানকার পণ্ডিতগণের সহিত

তাঁহাদের শাস্ত্রীয় বিচার হইত। সেই বিচারে জয়লাভ করিলে তবে তাঁহারা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। কুস্তির বেলাতেও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। তখন পঞ্জাবে কুস্তির চর্চ্চা বেশী পরিমাণে হইত, এবং পঞ্জাবী পালোয়ানরা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। এইরূপে বহু পঞ্জাবী পালোয়ান মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশ বিজয়ে আগমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার যেখানে যত পালোয়ান থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত পঞ্জাবী পালোয়ানদের কুস্তি হইত। স্বর্গীয় অম্বু গুহ প্রভৃতির আখড়ায় এবং ঢাকাই পালোয়ানগণের আখড়ায় এইরূপ বহু দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তরুণ যুবক শ্যামাকান্তের সহিত বল-পরীক্ষায় এইরূপ অনেক পঞ্জাবী পালোয়ানের পরাজয় ঘটিয়াছিল।

ইহার পর শ্যামাকান্ত কিছুদিন ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। কুস্তিতে দিগ্বিজয় করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল কি না তাহা জানা যায় না; কিন্তু সৈনিক হইবার প্রবল ইচ্ছা ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালীদিগকে সৈনিক বিভাগে গ্রহণ করিবার প্রথা রহিত হইয়াছিল বলিয়া সুযোগের অভাবে শ্যামাকান্তের এই সাধ পূর্ণ হয় নাই। দেশীয় রাজ্যের সৈন্য-বিভাগেও প্রবেশ করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল।

অতঃপর শ্যামাকান্ত ত্রিপুরার মহারাজের শরীর-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া দুই বৎসর কর্ম্ম করেন।

প্রতীচ্য ভূমি হইতে এ দেশে যে সকল জিনিস আমদানী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সার্কাস জিনিসটি তরুণ বঙ্গের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল—বহু বঙ্গীয় যুবক সার্কাসের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে যেমন বাহুবল, বীর্য্যবত্তা ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাওয়া যায় এমন আর

কিছুতে নহে। সুতরাং শ্যামাকান্তের ন্যায় তরুণ যুবক যে সার্কাসের দিকে সহজেই আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্যামাকান্ত বরিশালে আসিয়া তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে আসাম হইতে একটি চিতা বাঘ কিনিয়া আনিয়া তাহাকে ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

বিলাতী সার্কাসে দেখিয়াছি, সাহেব খেলোয়াড়রা বৈদ্যুতিক দণ্ড স্পর্শ করাইয়া বাঘ সিংহ প্রভৃতির গাত্রে 'সক' লাগাইয়া ভীতিবিহ্বল করিয়া তবে তাহাদের সঙ্গে খেলা করিয়া থাকেন। স্থল বিশেষে সিংহ-ব্যাঘ্রাদির নখর ও দন্ত প্রভৃতি বর্ম্মাবৃত করিয়া তবে তাহাদের সহিত খেলা করা হয়। বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা কিন্তু ও সকল রক্ষাকবচের ধার ধারেন না। ফুটবল ও ক্রিকেটের মাঠে বুট-পরা, লেগ-গার্ড আঁটা সাহেব খেলোয়াড়দের সঙ্গে বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা যেমন নগ্ন পদে বিনা লেগ-গার্ডে খেলা করিয়া থাকেন, এবং প্রায়ই জয়লাভও করিয়া থাকেন, বাঙ্গালীর সার্কাসেও তেমনি দেখা যায়, বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা প্রায়ই রিক্তহস্তে, বড় জোর একগাছি ছড়ি হাতে করিয়া খেলিয়া থাকেন। শ্যামাকান্ত প্রথম হইতেই রিক্তহস্তে সেই বন্য ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করেন। এবং মাস দুইয়ের মধ্যে তাহাকে তৈয়ার করিয়া লইয়া যেখান হইতে ব্যাঘ্রটি ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই সুনামগঞ্জে তাহার খেলা দেখাইতে আরম্ভ করেন। এইখানেই তাঁহার সার্কাস-জীবনের সূত্রপাত হয়। প্রথম ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও শ্যামাকান্ত যে সাহস ও হিংস্রজন্তু বশীকরণের কৌশল শিক্ষা করিলেন, তাহার ফলে তিনি ক্রমে বড় বড় আনকোরা বন্য বাঘ, সিংহ প্রভৃতির সহিত অবলীলা-ক্রমে খেলা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহস ও শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয়

পাইয়া ভাওয়াল—জয়দেবপুরের রাজা ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে দুইটি "রয়েল বেঙ্গল টাইগার" উপহার দিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থান হইতেও তিনি ব্যাঘ্রাদি উপহার প্রাপ্ত হন।

প্রথম বাঘটিকে শিক্ষা দিবার সময় শ্যামাকান্তকে ব্যাঘ্রের নখ-দন্তাঘাত অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরে নূতন নূতন ব্যাঘ্র বশ করিবার সময়, এবং সার্কাসে ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিবার সময়ও ব্যাঘ্রের নখর-দংষ্ট্রাঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; এমন কি, এক এক সময়ে তাঁহাকে সাংঘাতিক বিপদেও পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, এবং বিপজ্জনক অবস্থাতেও কেবল সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বুদ্ধি-কৌশলে বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ত কথাই নাই, অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক জীবজন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যদি লোকে ভীত হইয়া উঠে তবে তাহার বিপদের মাত্রা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যদি সে সময়ে ভীত না হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে বিপদের গুরুত্ব অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। শ্যামাকান্ত জীবজন্তুর এই মনোবৃত্তি উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছিলেন—কেবল অমিত সাহসের বলে তিনি ব্যাঘ্রের খাঁচা হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। সদ্যোধৃত বন্য ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিয়া শ্যামাকান্ত অনেকবার বহু পুরস্কার ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘটিও লাভ করিয়াছিলেন।

সার্কাসের ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করিবার পর তিনি কুক সাহেবের সার্কাসে যোগ দান করেন; বেতন হয় মাসিক দেড় হাজার টাকা। এই সাহেবের সার্কাসে তিনি মাত্র এক বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর নিজে সার্কাস দল গঠন করিয়া খেলা দেখাইতে আরম্ভ করেন। নানা স্থান ঘুরিয়া একবার রঙ্গপুরে আসিবার

পর যে বাড়ীতে তাঁহার সার্কাসের পশুগুলি রক্ষিত হইয়াছিল, ভূমিকম্পে সেই বাড়ী পড়িয়া গিয়া তাঁহার বহু জন্তু মারা যায়। অবশিষ্ট দুই একটি বাঘ লইয়া এবং আর দুই চারিটি নূতন জন্তু সংগ্রহ পূর্ব্বক শিক্ষাদান করিয়া অল্পকাল খেলা দেখাইবার পর সার্কাসে শ্যামাকান্তের বিতৃষ্ণা জন্মে এবং তিনি দল ভাঙ্গিয়া দেন।

বাঘ-সিংহের সহিত খেলা দেখানো ছাড়া শ্যামাকান্ত বুকে পাথর ভাঙ্গিতেন। এই খেলার উপকরণ ছিল দুইখানি চেয়ার ও বারো চৌদ্দ মণ ওজনের পাথর। চেয়ার দুইখানি এমন ভাবে রাখা হইত যে, তাহাদের মধ্যে প্রায় একটা মানুষের দৈর্ঘ্যের সমান ব্যবধান থাকিত। শ্যামাকান্ত এই দুইখানি চেয়ারের একখানির উপর মাথা ও অপরখানির উপর পদদ্বয় স্থাপন করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতেন। মাথা ও পা ব্যতীত দেহের অবশিষ্ট অংশ শূন্যে নিরবলম্ব ভাবে থাকিত। এইরূপ অবস্থায় তিনি দেহটিকে খুব শক্ত করিয়া রাখিতেন। তৎপরে তাঁহার বুকের উপর ১২।১৪ মণ ওজনের পাথরখানি স্থাপিত হইত, এবং একজন বলবান লোক একটা গুরুভার স্থূল লোহার হাতুড়ীর আঘাত করিয়া সেই পাথর ভাঙ্গিত। শ্যামাকান্ত অবিচলিত ভাবে এই আঘাত সহ্য করিতেন এবং প্রস্তরখানি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইত। এইরূপে শ্যামাকান্ত আরও কত রকম বলব্যঞ্জক খেলা দেখাইতেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

স্যাণ্ডো যে কত বড় বিখ্যাত জোয়ান তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। স্যাণ্ডোর উদ্ভাবিত ব্যায়াম-পদ্ধতি তাঁহার নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। সেই পদ্ধতিক্রমে ব্যায়াম করিবার সময় বালকরা বলে— স্যাণ্ডো করিতেছি। সেই স্যাণ্ডোকে শ্যামাকান্ত ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। স্যাণ্ডোর সঙ্গে এলমো নামে তাঁহার একজন বন্ধু এ দেশে আসিয়াছিলেন —তিনিও স্যাণ্ডোর সমানই জোয়ান। এই এলমোর সহিত শ্যামাকান্তের

মুষ্টি যুদ্ধ হয়। মিনিট দুই তিন পরেই শ্যামাকান্ত তাঁহাকে এমন এক রদ্দা দেন যে এলমো মিনিট পনেরো অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্যামাকান্ত দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, বিশেষতঃ পথে ঘাটে মাতৃজাতির অসম্মান, অবমাননা কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। এই কারণে—দুর্ব্বলকে, মাতৃজাতিকে অত্যাচার, অবমাননার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে গায়ে পড়িয়া লোকের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছে—একাকী একসঙ্গে বহু লোকের সহিত মারামারি করিতে হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই তিনি জয়লাভ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে শ্যামাকান্তের সংসার ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হন, এবং বহু তীর্থ দর্শন করিয়া ৺কাশীধামে উপস্থিত হন। শ্রীহট্ট জেলার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি ৩২ বৎসর তিব্বতে বাস করায় তিব্বতী বাবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামাকান্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া "সোঽহং স্বামী" নাম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক হিমালয়ের পাদমূলে (আধুনিক বিখ্যাত যক্ষ্মা-স্বাস্থ্যনিবাস) ভাওয়ালীতে সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন করেন। সেই আশ্রমে অবস্থিতি কালে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

শরীর চর্চ্চায় তাঁহার যেমন নিষ্ঠা ছিল, ধর্ম্মজীবনেও তিনি তদ্রূপ নিষ্ঠাবান ছিলেন। তৎ প্রণীত সোঽহং গীতা, সোঽহং তত্ত্ব, সোঽহং সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুহ

(গোবর)

দর্জিপাড়ার গুহবংশ বনীয়াদি বংশ—পালোয়ানের বংশ। এই বংশের অনেক বংশধর পুরুষানুক্রমে পালোয়ান। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুহ ওরফে গোবর বাবু এই বংশের অলঙ্কার—ভারতের গৌরব। তিনি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া, বড় বড় বিদেশী পালোয়ানদিগকে মল্ল-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পৃথিবীময় ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছেন।

দর্জিপাড়ার গুহবংশের তিন পুরুষের কুস্তিতে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন, এবং বঙ্গসন্তানগণকে কুস্তি শিখাইবার জন্য যত্ন ও অর্থব্যয় যথেষ্টই করিয়াছিলেন। ভারতে তিনি অম্বু গুহ নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁহার আখড়া অম্বু গুহের আখড়া বলিয়া পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের যে কোন স্থান হইতে যে কোন কুস্তীগীর কলিকাতায় আসিলেই একবারও অন্ততঃ তাঁহাকে অম্বুবাবুর কুস্তির আখড়ায় যাইতে হইত। সকলেই তাঁহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বলিয়া সম্মান করিত। তিনি ছিলেন মহা ধনবান—কুস্তি ছিল তাঁহার সখের ব্যাপার। এই সখ মিটাইবার জন্য তিনি অকাতরে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রবাবুও অদ্বিতীয় ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর ছিলেন। কুস্তিতে তিনি পিতার সমুদয় কীর্ত্তি ষোল আনা বজায় রাখিয়াছিলেন।

গোবরবাবু ক্ষেতুবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম রামচরণ গুহ মহাশয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ গোবরবাবুর জন্ম হয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুহ
(গোবর)

পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি—বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য রামচরণ বাবু গোবরকে ১৩ বৎসর বয়স (১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) হইতেই কুস্তি শিখাইতে লাগিলেন, এবং এজন্য নামজাদা পালোয়ানগণকে নিযুক্ত করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া গোবর অধিকতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তিনি যে কেবল একজন বড় কুস্তিগীর পালোয়ান তাহাই নহে, তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

গোবর একাধিকবার ইয়োরোপ-বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। ফিল লেন, জিমি ক্যাম্বেল, জিমি এসেন প্রভৃতি বড় বড় পালোয়ানদের হারাইয়া স্কটল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়ন এবং সমগ্র গ্রেটবৃটেনের চ্যাম্পিয়ান বলিয়া ঘোষিত হন। বিলাত হইতে ইয়োরোপে গিয়া কার্ল সাফ্‌ট প্রমুখ বড় বড় ইয়োরোপীয় পালোয়ানদিগকে হারাইয়া দিয়া বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এইরূপে ইয়োরোপ-বিজয়ের গৌরব লাভ করিয়া গোবর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসে। অনেক জায়গা হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল এবং অনেক চিঠি-লেখালিখিও হইয়াছিল। নিমন্ত্রণকর্ত্তাদের প্রস্তাব ছিল যে, আমেরিকায় গোবর বাবুকে দুই বৎসর থাকিতে হইবে এবং তাঁহারা যাতায়াতের রাহাখরচ, সেখানে বাস করিবার খরচ এবং একটা মোটা লভ্যাংশ দিবেন। Mr. Edward Delmukএর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গোবর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৬এ অক্টোবর পূজার অব্যবহিত পরেই তাঁহার শিষ্য শ্রীমান বনমালী ঘোষকে লইয়া আমেরিকায় যাত্রা করেন। আমেরিকায় যাইতে হইলে সোজাসুজি যাইবার ব্যবস্থা নাই—বিলাতে গিয়া সেখান হইতে আমেরিকাগামী জাহাজে সেখানে যাইতে হয়। নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি তাঁহারা বিলাত পৌছান।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহাদের জাহাজ আমেরিকায় পৌছিল। কিন্তু এসিয়াবাসী বলিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আমেরিকার ভূমিতে পদার্পণ করিবার অধিকার পাইলেন না। প্রায় ৩৮ দিন দুইটি দ্বীপে অবস্থান করিয়া অনেক কাট-খড় পোড়াইয়া তাঁহার এক বৎসর থাকিবার কড়ারে মার্কিন মাটীতে পদার্পণ করিবার অনুমতি লাভ করেন।

আমেরিকায় গোবরবাবুকে প্রথমে হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান Tommy Darrakএর সহিত লড়িতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় যিনি রেফারী হইয়াছিলেন তিনি নিতান্ত অন্যায় অবিচার করিয়া টমি ডারাককে জয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন।

ইহার পর তিনি চিকাগো নগরে প্রসিদ্ধ বোহিমিয়ান অজেয় পালোয়ান জো স্কাল্জের সহিত কুস্তি লড়িয়া একুশ মিনিটের মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। অতঃপর পরবর্ত্তী এপ্রেল মাসে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বী টমি ডারাকের সহিত আবার কুস্তি লড়েন। ১৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ড পরে তিনি ডারাককে একবার আছাড় মারেন। তাহার পর চারি মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড পরে দ্বিতীয়বার আছাড় মারিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

গোবরবাবু এক বৎসরের কড়ারে আমেরিকায় প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু কুস্তির কৌশল ও বাহুবলের পরিচয় দিয়া তিনি এমন জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে এ যাত্রায় তিনি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর আমেরিকায় থাকেন, এবং এই সময়ের মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ heavy weight champion Strangler Lewis, রাশিয়ার জগদ্বিখ্যাত পালোয়ান ষ্ট্যানিলাস জিস্কো ও তস্য ভ্রাতা সমান জোরের পালোয়ান ওয়ালডেক জিস্কো, জগদ্বিখ্যাত অতিকায় তুর্কি

পালোয়ান মহম্মদ, জো চেষ্টার প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত পালোয়ানের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া গোবরবাবু বাঙ্গালী যুবকদের শরীর সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ছয় সাত হাজারের অধিক। তাঁহার পদ্ধতিতে কুস্তি ও ব্যায়াম করিয়া শরীরে জোর যেমন বাড়ে, অথচ শরীরখানি তেমনি মোলায়েম থাকে—সাধারণ জিম্‌ন্যাষ্টকদিগের ন্যায় কাটখোট্টা চেহারা হয় না। সাধারণ ব্যায়ামে মাংসপেশী দৃঢ় ও সবল হয় বটে, কিন্তু জায়গায় জায়গায় অতি পুষ্ট এবং স্থানে স্থানে কম পুষ্ট থাকে—সর্ব্বত্র সমান থাকে না। গোবরবাবুর প্রক্রিয়ায় শরীরের সকল জায়গায় মাংস সমান ও যথাযথ ভাবে (symmetrical) থাকে—ইহাই তাঁহার পদ্ধতির বিশেষত্ব। ইহাতে দেহখানি বেশ সুন্দর দেখায়।

ভীম ভবানী

বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের অপবাদ ঘুচাইয়াছিলেন ভীম ভবানী অতি আশ্চর্য্য রকমে। দুর্ব্বল শরীরকে কিরূপে সবল করিতে হয়, ক্ষীণ দেহকে কিরূপে বীর দেহে পরিণত করিতে হয়, শরীরচর্চ্চা করিয়া কিরূপে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায় তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন ভীম ভবানী। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীঃ—এই মহামন্ত্র সার্থক করিয়াছেন ভীম ভবানী নিজেরই জীবনে।

কিছুকাল পূর্ব্বে বিডন ষ্ট্রীটে উপেন্দ্রনাথ সাহা নামক একটি ভদ্রলোক বাস করিতেন। ভীম ভবানী তাঁহারই মধ্যম পুত্র। তাঁহার আসল নাম ভবানীচরণ সাহা। কিন্তু অনেকে তাঁহাকে বাচকানী বলিয়া ডাকিত।

বিডন ষ্ট্রীটের সাহা-পরিবার বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন। এই পরিবারের শিশু ভবানীচরণের আদর যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না।

শৈশবে ভবানীচরণ বড় দুরন্ত ছিলেন। পিতা-মাতা তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। দুরন্ত বলিয়া সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত তাঁহার প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হইত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সামলাইতে পারিতেন না। উপেন্দ্রবাবু ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত থাকায় পুত্রকে শাসন ও সংযত করিবার সময় পাইতেন না, সেই জন্য তিনি পুত্রকে সঙ্গে করিয়া সিমলা ব্যায়াম-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার প্রতিবাসী ও বাল্যবন্ধু ক্ষুদিবাবু অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অতীনবাবুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেইদিন হইতে ভবানী ক্ষুদিবাবুর নিকট পুত্রবৎ স্নেহে 'মানুষ' হইতে লাগিলেন। ক্ষুদিবাবুর আখড়াতে ভবানী ব্যায়াম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় হইতেই ক্ষুদি বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া তিনি পিতৃবন্ধুর যত্নে উত্তমরূপে লেখাপড়া, জিম্‌ন্যাষ্টিক ও কুস্তি শিক্ষা করিলেন। একাগ্রতার সহিত ব্যায়ামচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করাতে তাঁহার শরীরের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। অচিরে তাঁহার চেহারা ফিরিয়া গিয়া বলব্যঞ্জক বীরমূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

ক্ষুদিরামবাবুর নিকট কুস্তি শিক্ষা করিয়া সেই তরুণ বয়সেই ভবানী অনেক পালোয়ানকে কুস্তিতে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে খয়েরা পালোয়ানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ভাবে কয় বৎসর ক্ষুদিবাবুর নিকট কাটাইবার পর ভবানী একদিন একটি সমবয়স্ক বালকের সহিত একজনদের বাগানে গিয়া একটি কাঁঠাল পাড়িয়া দুইজনে খাইয়া ফেলেন। বাগানের অধিকারীর বিনানুমতিতে তাঁহার দ্রব্য গ্রহণের কথা শুনিয়া ক্ষুদিবাবু তাঁহাকে শাসন করেন এবং শপথ করিয়া বলেন, আর তোকে বাড়ীতে ঢুকিতে

ভীম ভবানী

দিব না। তিনিও ভয়ে আর আসিতে পারেন না। এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান, এমন সময় একদিন ক্ষুদিবাবুর সঙ্গে দেখা। ক্ষুদিবাবু ভবানীকে ক্ষেতু বাবুর আখড়ায় ভর্ত্তি হইতে উপদেশ এবং অনুমতি দেন, এবং ক্ষেতুবাবুর শিষ্য নন্দ, নেড়া প্রভৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধ্য বা অন্ধকার যুগে বাঙ্গালী ভদ্রলোকরা শরীর-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া বাবু বনিয়া গিয়াছিলেন। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন অম্বু গুহ। এই গুহ বংশ বনিয়াদী বংশ। অম্বু গুহ মহাশয় দেখিলেন শরীরচর্চ্চার অভাবে বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তাই তিনি নিজ বাটীতে একটি কুস্তির আখড়া স্থাপন করিলেন। তিনি নিজে ছিলেন ভারত-বিখ্যাত পালোয়ান। তিনি আখড়া স্থাপন করিয়া বাঙ্গালীদিগকে কুস্তি শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এজন্য তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার আখড়া ক্রমে এমন বিখ্যাত হইয়া উঠে যে, বাঙ্গালার বাহির হইতে অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষার্থীরা আসিয়াও তাঁহার আখড়া হইতে কুস্তি শিখিয়া যাইত। এইরূপে তিনি কত পালোয়ান যে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। কেবল শিক্ষার্থী কেন, অন্যান্য প্রদেশ হইতে নামজাদা পালোয়ানরা সব দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া অম্বুবাবুর আখড়ায় আসিয়া কুস্তি করিয়া যাইত।

অম্বুবাবু বাঙ্গালীর ছেলেদের এমন ভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, কানাই সেন, তুলসী পাঠক, ত্রৈলোক্য বসাক, গোঁসাই কলু, নগেন বসু, জগদীশ বসু ইত্যাদি অনেকেই অনেক বড় পালোয়ানের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ বয়সেও মণীন্দ্রনাথ বসু নামক একটি বালককে এমন তৈয়ার করিয়াছিলেন যে, মণিবাবু অনেক বড় পালোয়ানের সহিত কুস্তি করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

অম্বুবাবুর পুত্র ক্ষেতুবাবুও একজন বড় পালোয়ান ছিলেন। তিনি পিতার কীর্ত্তি অনেক বাড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতে এমন নামজাদা পালোয়ান একজনও ছিল না, যে অন্ততঃ একবারও আসিয়া ক্ষেতুবাবুর আখড়ায় কুস্তি করিয়া যায় নাই। ভবানী, ক্ষেতুবাবুর কাছে আসিয়া বলিলেন, আমায় কুস্তি শিখাইতে হইবে। ক্ষেতুবাবু মানুষ চিনিতে পারিতেন। ক্ষুদিবাবুর কাছে ব্যায়াম করিতে শিখিয়া ভবানীর দেহখানি বেশ যুৎসই হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চেহারা দেখিয়াই ক্ষেতুবাবু বুঝিতে পারিলেন. ইহাকে যত্ন করিয়া শিখাইতে পারিলে এ একজন পালোয়ানের মতন পালোয়ান হইতে পারিবে।

দ্রোণাচার্য্যের শত শত শিষ্য ছিল, সকলকেই তিনি যত্ন করিয়া অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের মধ্যে অস্ত্রশিক্ষায় অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার কারণ, অন্যান্য শিষ্যদের চাইতে তাঁহার আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল সব চেয়ে বেশী। শিষ্যের যদি শিখিবার আগ্রহ থাকে তবে তাহাকে শিখাইতে গুরুর অত্যন্ত আগ্রহ হয়, এরূপ শিষ্যকে গুরুও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শিখাইয়া থাকেন। কুস্তি শিখিতে ভবানীর আন্তরিকতা ও একান্ত আগ্রহ দেখিয়া ক্ষেতুবাবুও তাঁহাকে পরম যত্নে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উনিশ বছর বয়সেই তাঁহার চেহারাখানি আড়ে-ওসারে মস্ত বীর পুরুষের মতন হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা তাঁহাকে চিনিত না, রাস্তায় দেখিলে তাহারা বলাবলি করিত—লোকটি দৈত্য, না মহাভারতের ভীমসেন?

সার্কাসের প্রতি বলবান বাঙ্গালী ছেলেদের বরাবরই কেমন একটা মোহ আছে। কেবল আমাদের দেশের ছেলেদের কথাই বা বলি কেন,—অনেক দেশেরই ছেলে, এমন কি, মেয়েরাও সার্কাসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সার্কাসের দলে যোগ দিতে, কিম্বা নিজেরা দল বাঁধিয়া

সার্কাস করিতে, অন্ততঃ নকল সার্কাসের অভিনয় করিতে ছুটিয়াছে। সাহেবরা যখন এ দেশে প্রথম সার্কাস আনিয়া খেলা দেখাইতে সুরু করে, তখন অনেক বাঙ্গালী ছেলে সার্কাসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের কুস্তি কসরত কিম্বা জিমন্যাষ্টিক করার অভ্যাস ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে সার্কাসের দলে যোগ দিয়াও ছিল। সে কথা পরে হইবে। এখন ভবানী কেমন করিয়া সার্কাসের দলে জুটিয়া গেলেন, তাহাই বলি।

ভবানী সবে মাত্র কুস্তীতে নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বয়স তখন তাঁহার সবে উনিশ বছর—ইয়া লম্বা-চওড়া ভীমের মতন চেহারা। এমন দিনে প্রোফেসর রামমূর্ত্তি তাঁহার সার্কাসের দল লইয়া কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসিয়াছেন। রামমূর্ত্তির তখন ভারত-যোড়া নাম। ব্যক্তিগত ভাবেই তিনি তখন একটা মস্ত বড় আকর্ষণের বস্তু। তাহার উপর সঙ্গে সার্কাসের দল। রোজ রাত্রে তাঁহার সার্কাস দেখিবার জন্য সমস্ত কলিকাতা সহর ভাঙ্গিয়া পড়ে—তাঁবুতে তিল ধরিবার জায়গা থাকে না, এমনই লোকের ভীড়!

এমন একটা ব্যাপার দেখিবার জন্য ভবানীর মতন লোক যে ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, সে কথা না বলিলেও চলে।

একদিন ভবানী, ক্ষুদিবাবু, জীবন পাঠক এবং আরও অনেকে রামমূর্ত্তির সার্কাস দেখিতে গেলেন। নানা রকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য চমকপ্রদ খেলা দেখিয়া সকলে সন্তোষলাভ করিলেন। খেলা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তাঁহারা সকলে রিঙ্‌এর ভিতরে গিয়া রামমূর্ত্তির সার্কাসের খেলার সরঞ্জামগুলি (apparatus) পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে রামমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় করিলেন। ভবানীর শরীরের গঠন দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া অনেক সুখ্যাতি করিলেন। এই সূত্রে ভবানী রামমূর্ত্তির সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন।

সেইখানে বসিয়া উভয়ের অনেক আলাপ হইল। রামমূর্ত্তি ভবানীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় লইতে লাগিলেন। ভবানীর বয়সের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রামমূর্ত্তি বলিলেন, তুমি ত বালক দেখিতেছি। এই বয়সে তুমি কেমন করিয়া শরীরটিকে এমন বাঁধিলে ?

ইহার পর উভয়ে অনেক কথা হইল। রামমূর্ত্তি বলিলেন, তোমার মতন লোক পাইলে শিক্ষা দিয়া আমি অসাধ্য সাধন করিতে পারি।

রামমূর্ত্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ভবানী আহ্লাদে গলিয়া গেলেন—সার্কাসের দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

ইহার পর রামমূর্ত্তি যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, ততদিনই তাঁহার নিমন্ত্রণে ভবানী সার্কাস দেখিতে যাইতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক পরামর্শ হইল। ভবানী রামমূর্ত্তির সার্কাসে যোগ দিতে স্বীকার করিলেন।

কিন্তু স্নেহ-দুর্ব্বল বাঙ্গালী-মায়ের দুর্ব্বলতা তাঁহার অজানা ছিল না। মাকে বলিলে তিনি যে কিছুতেই তাঁহাকে রামমূর্ত্তির সঙ্গে যাইতে দিবেন না তাহাও তিনি জানিতেন। এরূপ অবস্থায় অন্য অনেক বাঙ্গালীর ছেলে যাহা করিয়া থাকে এবং করিতেছে ভবানীও তাহাই করিলেন। রামমূর্ত্তি যেদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া বিদেশে যাত্রা করিবেন, সেইদিন ভবানী গোপনে তাঁহার দলে যোগ দিলেন। তাহার পর একেবারে সেই রেঙ্গুন।

রামমূর্ত্তির সার্কাস দলের সঙ্গে থাকিয়া ভীম-ভবানী অনেক দেশ ভ্রমণ করেন, এবং রামমূর্ত্তির কাছে তিনি সার্কাসের প্রচলিত অনেক ক্রীড়া কৌশল শিক্ষা করেন। এই সকল ক্রীড়ায় তিনি এমন নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, সাগরেদ্ হইয়াও তিনি অনেক বিষয়ে গুরুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি এমন কতকগুলি ব্যায়ামের

কৌশল দেখাইতেন যাহা আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী ত দূরের কথা, কোন ভারতবাসী, এমন কি, পৃথিবীর অনেক নামজাদা ব্যায়ামবীর দেখাইতে পারেন নাই। তিনি তিনখানা মোটর টানিয়া রাখিতে, দুইটি হাতী বুকে ধরিতে, সাড়ে চার মণ বারবেল মাথার উপর তুলিতে, দাঁতে ঘোড়া ও ভারী রোলার তুলিতে, কাঁধে মোটা লোহার জয়েন্ট বাঁকাইতে, দুই টন রোলার বুকে ধারণ করিতে এবং মোটা লোহার শিকল জড়াইয়া উপর বাহুর জোর দিয়া পটাপট্ ছিঁড়িতে পারিতেন। ইহা ছাড়াও তিনি আরও অনেক কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

রামমূর্ত্তির সার্কাস দলের সঙ্গে তিনি যখন যাভায় গিয়াছিলেন, তখন একজন ওলন্দাজ পালোয়ান রামমূর্ত্তিকে চ্যালেঞ্জ করিলেন।

সকল দেশে সভ্য অসভ্য সকল জাতির মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম আছে যে, কেহ কাহাকেও চ্যালেঞ্জ করিলে সেই চ্যালেঞ্জ যদি গ্রহণ না করা হয় তাহা হইলে বড় অপমান—অর্থাৎ হার স্বীকার করিতে হয়। যুদ্ধে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে, দাবা কিম্বা পাশাখেলায়, পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে—সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। এমন কি, আদিম অসভ্য জাতিরাও এই নিয়ম মানিয়া চলে। তাই দুর্য্যোধন বার বার যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আহ্বান করিলেও যুধিষ্ঠিরকে রাজী হইতে হইয়াছিল। বড় বড় পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় বিচারেও এই নিয়ম আছে।

ওলন্দাজ পালোয়ানের প্রস্তাবে রামমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলেন। কিন্তু ভীম-ভবানী বাধা দিলেন। বলিলেন, সে কি মহাশয়, আমি সাগ্‌রেদ উপস্থিত থাকিতে আপনি খেলিবেন কেন? আগে আমার সঙ্গে কুস্তি হউক। আমি যদি হারিয়া যাই, তখন উনি আপনার সঙ্গে লড়িবেন।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ভিতর এটাও আছে যে, গুরু শিষ্য এক জায়গায়

উপস্থিত থাকিলে আগে শিষ্যের সঙ্গে লড়িতে হয়। তার পর শিষ্য হারিলে স্বয়ং গুরুকে লড়িতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল—ওলন্দাজ পালোয়ানকে আগে ভীম-ভবানীর সহিত কুস্তি লড়িতে হইল। বেশীক্ষণ লড়িতে হইল না—মিনিট দুই তিনের মধ্যে ভীম-ভবানী দুই-একটি প্যাঁচ্ কষিয়া ওলন্দাজ পালোয়ানকে হারাইয়া দিলেন। সাংহাইতে তিনি একজন মার্কিণ পালোয়ানকে হারাইয়া দিয়া ১০০০ ডলার বাজী জিতিয়া লন। যেখানে দুই ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় বীরদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, সেখানের ব্যাপারটা অনেক সময় ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, জাতিগত হইয়া পড়ে; অর্থাৎ জাতটারই হার-জিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হইয়াছিল। এই মার্কিণ পালোয়ানটা কিন্তু অত্যন্ত নীচমনা ছিল। একে ত টাকার শোক, তার উপর জাতির অপমান। লোকটা ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীম-ভবানীকে গুপ্ত-হত্যা করিবার সঙ্কল্প করে। ভীম সাংহাইএর কনসাল অর্থাৎ বাণিজ্য-দূতকে এই কথা জানান। কনসালের চেষ্টায় ভবানী সে যাত্রা রক্ষা পান। এমন কি, কনসালের নূতন মিনার্ভা মোটর কার টানিয়া থামাইয়া সেখানা পুরস্কার-স্বরূপ লাভ করেন।

গুণী লোকের আদর সকলেই করে। রামমূর্ত্তির কাছে খেলা শিখিয়া সার্কাসে খেলা দেখাইয়া বিদেশেই ভবানীর গুণের কথা ছড়াইয়া পড়িল। গুণী লোককে নিজের দলে টানিয়া লইয়া তাহার খেলা দেখাইয়া উপার্জ্জন বেশী করিতে সকল সার্কাসওয়ালাই চায়। কৃষ্ণলাল বসাকও তখন তাঁহার সার্কাস লইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি ভবানীকে নিজের দলে ডাকিয়া লইলেন, এবং খেলা দেখাইবার অনেক সুবিধা করিয়া দিলেন।

ভবানীও ৪॥-৫ মণ ওজনের বার বেল ভাঙ্গিয়া, ৫-৭ জন লোকসহ

বিলাতী মাটির পীপে দাঁতে করিয়া তুলিয়া, ঘোড়ার পেটে-বুকে চামড়ার শক্ত চওড়া ফিতে বাঁধিয়া সেই চামড়ার ফিতে দাঁতে করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া ঘোড়াটাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া, বুকের উপর চল্লিশ মণ ওজনের পাথর চাপাইয়া তাহাতে কতকগুলি লোক বসাইয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রকম খেলা দেখাইয়া দর্শকদের তাক্ লাগাইয়া দিতেন। আর, এইসব খেলা দেখিয়া দেশ বিদেশের বড় বড় লোক ও রাজা মহারাজা প্রভৃতি তাঁহাকে হাতে হাতে নানা রকম জিনিস, নগদ টাকা প্রভৃতি পুরস্কার দিতেন। এই সময়ে কৃষ্ণলাল বসাকের সার্কাসের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে ভবানীকে অনেক জায়গায় কুস্তি লড়িতে হয় এবং সকল স্থলেই জয়ী হইয়া তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

সেকালের রাজারা কাহারও উপর বিরক্ত হইলে তাহাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিতেন। প্রহ্লাদ হরিনাম করিতেন, তাঁর বাবা হিরণ্যকশিপু তাহা সহিতে পারিতেন না বলিয়া প্রহ্লাদকে হরিনাম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সে কথা শুনেন নাই। তাই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া মারিবার হুকুম দিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ কিন্তু হাতীর পায়ের দ্বারা পিষ্ট হইয়াও মরেন নাই—অন্য কেহ হইলে তাহার হাড়-মাস গুঁড়া থেঁতো হইয়া তাল পাকাইয়া যাইত।

রামমূর্ত্তি সার্কাসে হাতী বুকে লইতেন। ভবানীও তাঁহার কাছে হাতী বুকে লইতে শিক্ষা করেন। তা সে সব সার্কাসের শিক্ষিত হাতী। তার উপর, অনেক সময় তাহাদের পেট ভরিয়া খোরাক মিলিত না। সেই জন্য তাহারা তত ভয়ঙ্কর ছিল না। কলির প্রহ্লাদ ভবানী একবার দুইটা বুনো হাতী বুকে লইতে গিয়াছিলেন। সেবার তাঁহার পেট ফাটিয়া যায়। অনেক কষ্টে সে যাত্রা তিনি বাঁচিয়া যান। পরে তিনি

বুনো হাতী বুকে লইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ইহার পর তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের সদ্যোধৃত একটা বুনো হাতী অনায়াসে বুকের উপর দিয়া চালাইতে দিয়া অক্ষত দেহে উঠিয়া আসিয়া নবাব বাহাদুর, লাট সাহেব ও অন্যান্য দর্শকদিগকে চমকিত করিয়া বহু পুরস্কার লাভ করেন। একবার তিনি ভরতপুরের মহারাজের তিনখানা শক্তিশালী মোটর টানিয়া থামাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন।

ভবানী দেশ বিদেশের অনেক প্রসিদ্ধ ও নামজাদা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কাহারও কাছে হারিয়া যান নাই। যেখানে তিনি নিজে জিতিতে পারেন নাই, সেখানেও তিনি হারেন নাই—অন্ততঃ সমান সমান হইয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুর মান ও নাম রাখিয়াছিলেন।

সে সব পালোয়ানও আবার যেমন তেমন পালোয়ান নয়—সকলেই নামজাদা দিগ্বিজয়ী মল্লবীর। এক সময় প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গিরিজা চোবের সহিত তাঁহার কুস্তি হয়। সে কুস্তি সমান সমান হয়। একবার ৺কাশী-ধামে তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ মল্লবীর স্বামীনাথের কুস্তি হয়। তাহাতে ভবানী জয়ী হন। পরে ভারতবিখ্যাত কাল্লু পালোয়ানের পুত্র ছোট গামার সহিত তাঁহার কুস্তি হয়। সে কুস্তিও সমান সমান যায়। একবার মজিদ পালোয়ানের সঙ্গে তাঁহার কুস্তি হয়; তাহাও সমান সমান যায়। বিদেশে যত পালোয়ানের সঙ্গে তাঁহার কুস্তি হইয়াছিল, সব গুলাতেই তিনি জিতিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে যে দেশে কুস্তি করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের Championএর সম্মান লাভ করিয়া-ছিলেন।

ক্ষেতুবাবুর মৃত্যুর পর হইতে ভবানী আবার ক্ষুদিবাবুর নিকট আসিতে লাগিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ক্ষুদিবাবু একবার

তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে পাঠান। সেই সময় ভবানী ঢাকা, মৈমনসিং প্রভৃতি স্থানে অনেক আখড়ার পত্তন করিয়া অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

একবার কলিকাতা এক্‌জিবিসনে তাঁহার খেলা দেখিয়া দেশের বড় বড় লোকরা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে "ভীম ভবানী" উপাধি দেন। সেই হইতে তিনি ভীম ভবানী নামে পরিচিত হন।

কৃষ্ণলাল বসাকের সার্কাস ছাড়িয়া দিয়া তিনি কিছুদিন আগাসীর সার্কাসে ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নিজে একটি সার্কাস গড়িয়া লোয়ার চিৎপুর রোডে খেলা দেখাইতেন।

১৩২৯ সালে কাশী হইতে অল্প জ্বর লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার নিউমোনিয়া হয়। সেই রোগে ১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেলা ২টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি রোলার অভ্যাস করিতেছিলেন। ডাক্তার বলেন, তাহাও মৃত্যুর একটা কারণ বটে।

এত অল্প বয়সে এমন একজন বীর পুরুষকে হারানো বাঙ্গালা দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এখন বাঙ্গালার তরুণ সম্প্রদায় তাঁহার ন্যায় বাহুবল অর্জ্জন করিতে পারিলে তাঁহার আত্মদান সার্থক হইবে—তরুণ-দলের মধ্যে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

বর্ষাতিবাবু

বৃহত্তর বঙ্গের বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে অমরনাথ রায় ছিলেন মস্ত বড় পালোয়ান। সাধারণতঃ তিনি বর্ষাতি বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার একটি আত্মীয়া মহিলা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

অমরনাথ রায় ছিলেন পাটনার বাঙ্গালী অধিবাসী। বাঙ্গালী হইলেও তিনি কুস্তির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অমরের পিতা সুরেশচন্দ্র রায় শৈশবেই মারা যান। অমরনাথের খুল্লতাত ধনেশচন্দ্র রায় তখন পাটনায় কমিশনার ছিলেন। তিনি পিতৃহীন বালকগুলিকে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন। অমরনাথেরা নয় ভাই—জ্যেষ্ঠ সোমনাথ, মধ্যম অমরনাথ—সকলেই অল্প বিস্তর মল্লবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তন্মধ্যে অমরনাথ সকলের শ্রেষ্ঠ। অমরনাথের বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন হইতে তিনি মল্লবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি মাছ মাংস খাইতেন না,—খালি ডাল, রুটি, ঘৃত ইহাই খাইতেন। তবে খাদ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত ছিল। আজিকালিকার আটজন বাঙ্গালীর খাদ্য তিনি একা খাইতেন। প্রত্যহ আখড়ায় যাইয়া কুস্তি করিতেন। তিনি মল্লবিদ্যার সকল কৌশলগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের গঠন প্রকৃত মল্লবীরের ন্যায় ছিল। সুডোল বাহু, প্রশস্ত বক্ষ, মাংসল স্কন্ধ, হস্তপদ অতিশয় কোমল; আবার ইচ্ছা করিলেই লৌহের ন্যায় কঠিন করিতে পারিতেন। তিনি পাটনার আখড়ার গৌরবের বস্তু ছিলেন। বেহার অঞ্চলে বর্ষাতিবাবু নামে তিনি বিখ্যাত ছিলেন (বর্ষাকালে তাঁহার পায়ে একরকম ফোস্কা হইত; তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, সেই জন্য তাঁহার নাম বর্ষাতিবাবু হইয়াছিল)। চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে ১৯।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়মিত কুস্তি করিয়া তিনি বিহারের অদ্বিতীয় কুস্তিগীর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে খেলাচ্ছলে দুই হস্ত মাথার উপর সংলগ্ন করিয়া প্রত্যেক বাহুতে দুই জন যুবাকে ঝুলিয়া থাকিতে বলিতেন এবং তদবস্থায় সকলকে লইয়া চক্রাকারে দ্রুত ভ্রমণ করিতেন। প্রতি দিন ১০০০ ডন ১০০০ বৈঠক্ অভ্যাস করিতেন। অনেক বড় বড় মল্লদের সহিত প্রায়ই তাঁহার বল পরীক্ষা হইত। বেহারে তখন বেহারী মল্লই
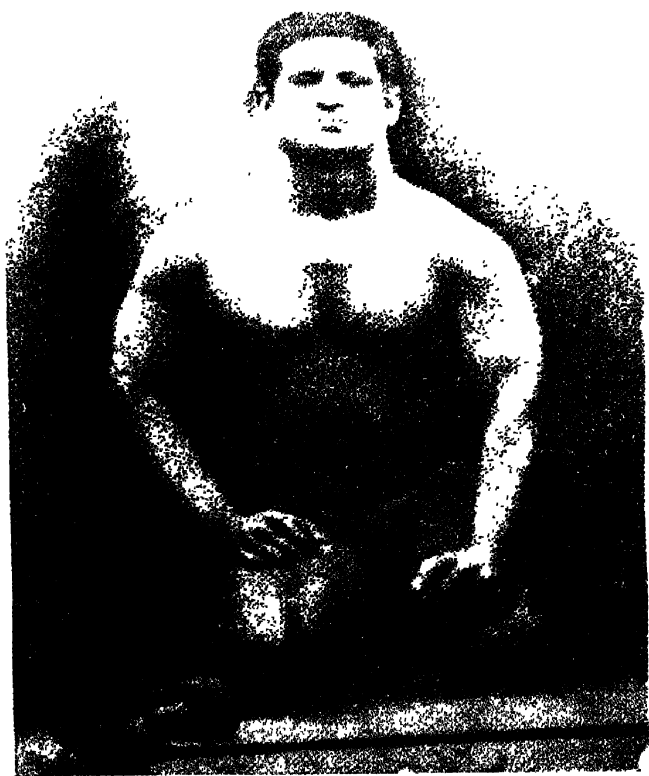
বর্ষাতি বাবু

(স্বর্গীয় অমরনাথ রায়

ছিল, বাঙ্গালী মল্ল কেহ ছিল না। সে জন্য বেহারী মল্লরা বাঙ্গালীর নিকট পরাজিত হইয়া অত্যন্ত অপমান বোধ করিত।

তিনি এইরূপ বিখ্যাত হইবার পর, ছাপরা হইতে এক বেহারী মল্ল আসিয়া বাঙ্গালীর গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে। সেই বেহারী যোদ্ধা অনেক দেশে মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া অমরনাথকে জয় করিবার জন্য পাটনায় আগমন করে। যুদ্ধের দিন স্থির হয়। যুদ্ধ আরম্ভের সময় মল্লরা পরস্পর "হাত মিলাইত"। সেই হাত মিলাইবার সময় বেহারী মল্লটা বেআইনি ভাবে হঠাৎ অমরনাথের রগে ভীষণ এক চপেটাঘাত করে। অমরনাথ হঠাৎ এরূপ অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নিজেকে সংযত করিয়া রীতিমত কুস্তির প্যাঁচ আরম্ভ করিয়া দেন। অনেকক্ষণ উভয়ে উভয়কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শেষ মুহূর্ত্তে অমরনাথ বেহারীমল্লটাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিবার সুযোগ পান। সেই সময় তাহার পূর্ব্বের অনিয়মিত প্রহারের শোধ তুলিয়া লন। এতক্ষণ রাগ দমন করিয়া কুস্তি করিতেছিলেন, এবার তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার বুকে বসিয়া এমন ভাবে চাপ দিয়াছিলেন যে, অপরে আসিয়া নিবারণ না করিলে সেদিন মল্লবীরের ভবলীলা সেইখানে সাঙ্গ হইত।

যা'হক তাহাকে দেশসুদ্ধ লোক অনিয়মিত প্রহারের জন্য ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল। সে পরাজিত হইয়া লোকের ধিক্কারে, লজ্জায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া রহিল। পরে উঠিয়া হেঁটমুণ্ডে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। সেই সময় হইতে অমরনাথ বেহারে অদ্বিতীয় মল্ল বলিয়া ঘোষিত হন।

অতীন বাবুর জ্যেষ্ঠতাত ৺নীলমাধব বাবু অমর বাবুর ভগিনীকে

বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন আসিতেন, অমরবাবু ভগিনীপতি নীলমাধববাবুর বাটীতেই থাকিতেন এবং অতীনবাবুর আখড়ায় কুস্তি করিতেন। একবার কলিকাতায় আসিয়া সকলে মিলিয়া ক্ষেতুবাবুর আখড়াতে যান। সে সময় অম্বুবাবু জীবিত এবং তখন তাঁহার পুরাতন আখড়া। ক্ষেতুবাবুর সহিত তাঁহার কুস্তি করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। অম্বুবাবু তাঁহার শরীর দেখিয়াই তাঁহার জোরের পরিমাণ অনুভব করিয়া লইয়াছিলেন। জহুরীই জহরৎ চেনে। অম্বুবাবু তখন তাঁহাকে তাঁহাদের আখড়ার একটী সীসার ডম্বল তুলিতে বলেন। তিনি অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতে সেটী তুলিয়া দেন। ক্ষেতুবাবুর সহিত কুস্তি করিবার ইচ্ছা লইয়া সেখানে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অম্বুবাবু মত না দেওয়ায় কুস্তি হয় নাই।

আর একবার এলাহাবাদে তখন কংগ্রেস হইতেছিল। সেই উপলক্ষে অমরনাথ এলাহাবাদে ভ্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় গোরা সৈন্যদের জন্য একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। সেই যন্ত্রের মধ্যস্থলে একটি গোলক আছে, সেই গোলকটিকে হস্ত, পদ ও বক্ষের দ্বারা ঠেলিয়া উচ্চে স্থাপন করিতে হয়। এক কালে হস্তের দ্বারা আকর্ষণ—পদের দ্বারা ঠেলিতে হয়। যে সর্ব্বোচ্চ সীমায় লইয়া যাইবে তাহার জন্য পুরস্কারও ঘোষিত হয়। যেখানে এই বল পরীক্ষা হইতেছিল সেখানে অসংখ্য লোকের ভীড় জমিয়া যায়। যাহাতে বাহিরের লোক ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, সে জন্য চারিদিকে বেড়া বাঁধা ছিল। অপর লোকের সহিত অমরনাথও দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে-ছিলেন। গোরাদের মধ্যে একে একে অনেকে আসিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। কেহ ৮ নম্বরে, কেহ ৯, কেহ ১০, কেহ বা অতি কষ্টে ১২ নম্বরে আনিয়া ছাড়িয়া দিতেছিল। ১৮ নম্বরে আনিতে পারিলে পুরস্কার পাইবার

আশা ; কিন্তু কেহই আর উঠিতে পারিতেছিল না। অমরনাথ তখন ১৯ বৎসরের তরুণ যুবা—দেহে অসুরের মত শক্তি, মনেও অসীম সাহস, —উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা বর্ত্তমান। বারংবার সকলকে পরাস্ত হইতে দেখিয়া তাঁহার নিজের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তিনি বেড়া ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গোরারা সকলে তাড়া করিয়া আসিল। তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন যে তিনি যন্ত্রটি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান। তাহারা বাতুলের প্রস্তাব মনে করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভাবিল, —আমরা হেন গোরা যাহা পারিলাম না, তাহা এই একটা কালা আদমি পারিবে ? অসম্ভব ! তাহারা বুঝাইল যে ইহা অসাধ্য। কিন্তু অমরনাথ দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন যে তিনি নিশ্চয় পারিবেন। গোরারা তাঁহার জাতির পরিচয় জানিতে চাহিল। তিনি যখন বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তাহারা অবজ্ঞার সহিত ভাবিল, এই ভীরু বাঙ্গালীটার ধৃষ্টতার পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। ইহাকে যন্ত্র একবার পরীক্ষা করিতে দিলে, এত লোকের সাক্ষাতে সে পরাজিত হইলে, সকলে মিলিয়া করতালি দিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া বিদায় করিব। আর এটা একটা মজাও হইবে মন্দ নয়। এই মনে করিয়া তাহারা সম্মতি দিল।

অমরনাথ এইবার যন্ত্রের সম্মুখে আসিয়া হস্ত, পদ ও বক্ষের দ্বারা একযোগে শক্তি প্রয়োগ করিয়া গোলকটি একেবারে শীর্ষস্থানে ১৯ নম্বরে আনিয়া স্থাপন করিলেন। গোরা সকল ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। দেশী লোকের বিরাট জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। তখন গোরারা সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল—তুমি কি খাও, কত বয়স, কোন্ জাতি, কোথায় নিবাস ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন তাহারা শুনিল মাত্র ১৯ বৎসর তাঁহার বয়স,

তিনি নিরামিষভোজী এবং বাঙ্গালী, তখন সত্যই তাহারা বিস্মিত হইয়া অমরনাথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টিপিয়া দেখিতে লাগিল।

তথাপি তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার তাঁহাকে দিল না। কারণ এ পুরস্কার একমাত্র তাহাদের জন্যই ঘোষিত—বাহিরের লোকের জন্যই নয়। সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী বড় বড় হেডিং দিয়া প্রকাশিত হইল।

অমরনাথের এই কীর্ত্তি প্রকাশ পাইলে কুচবেহারের মহারাজা অমরনাথকে উচ্চ বেতনে নিজ ষ্টেটের মল্ল নিযুক্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু তখন বাঙ্গালী দৈহিক বলের মর্য্যাদা দিতে শেখে নাই—অমরনাথের অভিভাবকবর্গ অসম্মত হইলেন। অভিভাবকবর্গ মল্লবীরের চাকুরী অপমানজনক মনে করিলেন। অমরনাথকে কুস্তি পরিত্যাগ করিয়া সার্ভে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। ইহাই তাঁহার পক্ষে কাল স্বরূপ হইল। মল্লের সুখী শরীর বনে জঙ্গলে সার্ভে করিয়া বেড়ানয় অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার প্রস্রাবের ব্যায়রাম ছিল; ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সে অকালে যক্ষ্মারোগে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইল।

তিনি মল্ল-ক্রীড়া লইয়া থাকিলে হয় ত অকালে মারা যাইতেন না। তিনি বাঁচিয়া মল্লচর্চ্চায় রত থাকিলে হয় ত দ্বিতীয় রামমূর্ত্তি হইতে পারিতেন। তিনি শেষ বয়সে বহুবাজারের উপেন মিত্র মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

কিন্তু বাঙ্গালী তখন মল্লকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই। তাই আজ বর্ষাতির নাম লুপ্ত হইয়াছে। নচেৎ বর্ষাতির দ্বারা হয় ত বাঙ্গালার গৌরবের আর এক অধ্যায় লিখিত হইত।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা

ইনি অতি প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর। এখন ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের বোর্ডিং—হার্ডিং হোষ্টেলের, আর সিটি কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক।

বাঙ্গালা ১২৯৯ সালে বরিশালে রাজেন বাবুর জন্ম হয়। তাঁহাদের পৈত্রিক নিবাস বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে। তাঁহার পিতা বসন্তকুমার গুহ প্রসিদ্ধ জোয়ান ছিলেন। ছেলেবেলায় রাজেনবাবু কিন্তু রুগ্ন, দুর্ব্বল ছিলেন। শৈশবে তাঁহার পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন।

শিশুকালে তাঁহার পঞ্জরাস্থির পীড়া হয়। একবার নিউমোনিয়ায় তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। সুতরাং বাল্যকালে তাঁহার শরীরের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এমন অবস্থায় একবার টাইফয়েড জ্বরে কিছুদিন ভুগিতেও হইয়াছিল। সেই রোগা ছেলে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতে ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিয়া শরীরখানিকে যাহা তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা আজকালকার ছেলেদের আদর্শ স্থল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর গায়ে এত জোর, শরীরখানি এমন লোহার মতন শক্ত হইয়াছিল যে, প্রোফেসর রামমূর্ত্তি সার্কাস লইয়া কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসিলে রাজেনবাবু তাঁহাকে Challenge করিয়াছিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে অসংখ্য রামমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া দিবেন। তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে—তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষায় বাঙ্গালায় অনেক রামমূর্ত্তি তৈয়ার হইতেছে।

১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে সেই যে তিনি নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে সুরু করেন, আজও তাহা সমানভাবে চলিতেছে।

তা ছাড়া, তাঁহার সাহস সেই ছেলেবেলা হইতেই অনেক বেশী ছিল। তখনই তিনি ঘোড়ায় চড়িতে শিখেন, এবং কৈশোরে রীতিমত ঘোড়-সওয়ার হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুষ্ট ঘোড়াকে শাসনে সংযত রাখিতে সেই বয়সেই তিনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মামার বাড়ীতে তিনি যে খুবই আদর-যত্ন পাইতেন তাহা বলা যায় না। সেইজন্য তিনি একবার বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া একটা সার্কাস দলে ঢুকিয়া পড়েন, এবং এক মাস সেখানে থাকিয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তিনি বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসনের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন—তাহার পর তাঁহার পড়াশুনা আর অগ্রসর হয় নাই। পড়াশুনা বেশী না হইলেও ব্যায়ামে তিনি সেই সময়েই খুব উন্নতি করেন। ডনবৈঠক ও অন্যান্য সকল রকম ব্যায়াম কৌশল ত তিনি শিখিয়া লইয়াছিলেনই, তাহার উপর পাঁচ মণ ওজনের পাথর বুকের উপর লইতে অভ্যাস করেন। পাঁচ মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কিছু কিছু করিয়া বাড়াইয়া ক্রমে তিনি ১০।১২ মণ ওজনের পাথরও বুকে লইতে পারিতেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে এক দরবার হয়। সেইদিন তিনি দরবার স্থলে প্রায় ২৮ মণ ওজনের একটি রোলার বুকে লইলেন। তাহার উপর পাঁচ মণ ওজনের একটা পাথর চাপানো হইল। তাহার উপর আবার চারিজন লোক চড়িয়া বসিল। রাজেন বাবু বলেন, রামমূর্ত্তি প্রথম বুকের উপর হাতী লওয়ার পথ দেখান, আর রাজেন বাবুই বুকের উপর রোলার লইবার প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি ১॥ টন পর্য্যন্ত ওজনের রোলার বুকে লইতে পারেন। ১৯১৩ সালে তিনি ৩॥ টন ওজনের রোলার বুকে লন। ১৯১৪ সালে তিনি amateur private performanceএর প্রবর্ত্তন করেন। এবং আর্ম্মানীটোলা বায়োস্কোপ হলে

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা

ঢাকার নবাবের মোটর নিজের অভ্যাসে—কাহারও সাহায্য না লইয়া কিম্বা কাহারও কাছে শিক্ষা না করিয়া—থামান। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, ডি, এসকোলি রাজেন বাবুকে টাইটেল দেন—A man of great strength, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার পত্নীকে যেদিন বিদায় দেন, সেইদিন তিনি নিজে পত্নীর মোটর চালাইয়াছিলেন; রাজেন বাবু সেই মোটর আটকাইয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে মৈমনসিংহ—মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর বাড়ীতে রোলার বুকে লন ও মোটর থামান।

১৯১৭ সালে যখন কার্লেকর সার্কাস কলিকাতায় আসে, তখন রাজেনবাবু সর্ব্বপ্রথম ৪ টন রোলার বুকে লন। ১৯১৮ সালে অলডার্স সার্কাস কলিকাতায় আসিলে সর্ব্বপ্রথম হাতী লইয়া দর্শকগণকে চমকিত করেন। ১৯১৯ সালে মামার বাড়ীতে ক্রমান্বয়ে ৭ দিন ২ খানা গরুর গাড়ী বুকে লওয়ার পর টানার দোষে পঞ্জরাস্থিতে চোট লাগে। এই বৎসর প্রোফেসর রামমূর্ত্তি বরিশালে সার্কাস দেখাইতে গেলে রাজেনবাবু রামমূর্ত্তিকে বলেন, তিনি তাঁহার সব খেলা দেখাইতে পারেন। রামমূর্ত্তি বলেন, তাহা যদি পার, তাহা হইলে আমি আমার সব খেলার সরঞ্জাম তোমাকে দিয়া দিব। রাজেনবাবু খেলা দেখান, কিন্তু রামমূর্ত্তি তাঁহার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে অস্বীকৃত হন। তখন রাজেনবাবু রাগিয়া গিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে রামমূর্ত্তিকে জানাইয়া দেন যে, তোমার মত এক শত রামমূর্ত্তি এই বাঙ্গলা দেশ হইতে তৈয়ার করিয়া দিব।

১৯২০ সাল হইতে রাজেনবাবু কলিকাতার ছাত্রদিগের মধ্য হইতে রামমূর্ত্তি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করেন। একটি প্রদর্শনী (social gathering) করিয়া তিনি অনেক কসরত দেখান। ইহাতে ছাত্র-সমাজে বিলক্ষণ উৎসাহের সঞ্চার হয়। তিনি সিটি কলেজের কম্পাউণ্ডে

প্রতি বৎসর একটা physical feats দেখাইবার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

সিটি কলেজে physical instructorএর কর্ম্ম গ্রহণ ও খেলা দেখাইবার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২১ সালে তাঁহার প্রথম ও প্রধান ছাত্র শ্রীমান গোপাল চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (ইনি তখন সিটি কলেজে পড়িতেন; এখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের advocate) ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মোটর থামান। এখন তিনি তিনখানা মোটর থামাইতে পারেন। পর বৎসর ১৯২২ সালে রাজেনবাবুর আর একটি ছাত্র শ্রীমান হীরেন্দ্র বসু মোটর accident করেন। মোটরখানি দূর হইতে জোরে চালাইয়া দিয়া তাঁহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করে—তিনি গাড়ীখানাকে ঠেলিয়া রাখেন। আর একটা খেলা তিনি দেখান। সেটা মোটর pushing—দুইখানি মোটর দুই দিক হইতে জোরে আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দেয়, তিনি দুই হাতে ঐ দুইখানিকে দুই দিকে ঠেলিয়া রাখেন।

১৯২৩ সালে গোপালবাবু প্রথম তিনখানা মোটব আটকান। এই বৎসর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরী প্রথম ভার উত্তোলনে নাম করেন। তিনি bend pressএ এক হাতে রাজেনবাবুকে তুলিতেন। ১৯২৪ সালে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় ভার উত্তোলনে এবং bend pressএ একটা সাইকেলের উপর একজন লোক বসাইয়া এক হাতে তুলিতেন। ১৯২৯ সালে শ্রীযুক্ত সত্যপদ ভট্টাচার্য্য বি-এসসি ভূপেনবাবুর বাড়ীতে নিখিল বঙ্গীয় ভার-উত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। আর জ্যোতিরিন্দ্র, বাগবাজারে ১০—১১ ষ্টোনের ভিতর প্রথম হন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষ মাংসপেশীর সঙ্কোচন প্রসারণে বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম হন। ১৯২৫ সালে শৈলেন্দ্রনাথ প্রথম রোলার

বুকে লন। ১৯২৬ সালে ভূপেশ কর্ম্মকার muscle controlling, Bar bending ও মোটর থামানো প্রদর্শন করেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত শিকল ছিঁড়িতে, লৌহদণ্ড বাঁকাইতে ও মাংসপেশীর সঙ্কোচনে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব দেখান। তিনি একই দিকে গতিশীল তিনখানি মোটর থামান। ১৯২৬ সালে সেলার্স সার্কাস যে charity performance করেন, তাহাতে শৈলেন ও কেশব বুকে হাতী লন। রাজেনবাবুও একবার সেলার্স সার্কাসে ও ১৯২০ সালে একবার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় হাতী বুকে লন।

১৯২৬ সালে রাজেনবাবু একবার নোয়াখালিতে দেওপাড়ায় ঠাকুরদের বাড়ী বড় হাতী বুকে লইয়াছিলেন।

তিনি সবচেয়ে অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন চট্টগ্রামে। ১৯২৭ সালে সেখানে মহাজনহাট নামক স্থানে রায় বাহাদুরদের বাড়ীতে খেলা দেখাইবার ব্যবস্থা হয়। রায় বাহাদুরদের একটা অতি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। এত বড় হাতী সচরাচর দেখা যায় না—বুকে লওয়া ত দূরের কথা। রাজেনবাবু অন্যান্য খেলা দেখাইবার পর বলেন, সেই প্রকাণ্ড হাতী তিনি বুকে লইবেন। হাতীটা দশ ফিটের চেয়ে উঁচু ; তার ওজন ১১৫ মণ। আর যে তক্তার উপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে তাহার ওজন ৮ মণ। রাজেনবাবুকে মোট ১২৩ মণ ভার বুকে লইতে হইবে।

প্রস্তাব শুনিবামাত্র দর্শকরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, এবং তারস্বরে আপত্তি করিতে লাগিল যে, তাঁহারা performance enjoy করিতে আসিয়াছেন—হাতী বুকে লইবার সময় নরহত্যার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে আসেন নাই। কিন্তু রাজেন বাবু নাছোড়বান্দা—হাতী তিনি বুকে লইবেনই। কোন ওজর আপত্তিতে

যখন কোন ফল হইল না, তখন লোকে তাঁহাকে 'খরচ লিখিয়া' অগত্যা সম্মতি দিল। রাজেনবাবু দর্শকদের আপত্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন, মানুষ ত সহজে ভগবানের নাম করিতে চায় না—নিতান্ত কারে পড়িলেই তবে ভগবানের নাম করে। তাঁহার আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করিয়া লোকে যদি কিছুক্ষণও ভগবানের নাম করে, তবে সেইটাই লাভ—অন্ততঃ কিছুক্ষণ ভগবানের নাম করা হয়।

রাজেন বাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হাতী বুকে লইবার উদ্যোগ আয়োজন হইল। সেকালে লোকে তীর্থযাত্রা করিবার সময় যে ভাবে উইল করিয়া বাহির হইত, রাজেনবাবুও ঠিক সেই ভাব-প্রণোদিত হইয়া দর্শক-জনসাধারণের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া আসরে নামিলেন। দর্শকরা মনে মনে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিল—রাজেনবাবু যেন নিরাপদে এই অসমসাহসিক খেলা দেখাইতে পারেন।

হাতী লওয়ার পর দেখা গেল, বড় বড় ছাত্ররা, যাহারা সামনে ছিল, তাহারা সকলেই একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আরও দেখা গেল, ৪।৫টি মহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। হাতী লওয়ার পরও দর্শকদের আপত্তি ও প্রতিবাদের বিরাম ছিল না—সকলেই বলিতেছিল, রাজেনবাবুর এমন অসমসাহসিক কর্ম্মে নামা উচিত হয় নাই।

১৯২৮ সালে চাঁদপুরে তিনি বুকে হাতী লন।

রাজেনবাবু কেবল নিজের শরীরটিকে তৈয়ার করিয়াই ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের শরীর যাহাতে রীতিমত গঠিত হয়, সে দিকেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি কোন দিন এই লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। বিশেষতঃ প্রোফেসর রামমূর্ত্তির কাছে তাঁহার স্পর্দ্ধাসূচক প্রতিজ্ঞাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। ১৯২০ সাল হইতে তিনি তাঁহার লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হন, এবং বাঙ্গালার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্যায়াম-

শালার প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। ব্যায়াম প্রচারের জন্য ১৯২৮ সাল হইতে তিনি All Bengal Physical Culture Association নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাঁহার ও ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি মহোদয়ের চেষ্টায় University of Physical Culture নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ব্যায়াম শিক্ষক তৈয়ার করা এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। বাঙ্গালায় যাহাতে ব্যায়াম-চর্চ্চার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়—এই প্রতিষ্ঠান সে পক্ষে নানা প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। গ্রাজুয়েট ভিন্ন অপর কাহাকেও এই ইউনিভার্সিটির সদস্য করা হয় না। নানা রকম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্যায়াম এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখানকার নিয়ম—one year course for physical instructor আর six months course for drill master. অর্থাৎ যিনি ব্যায়াম-শিক্ষক হইবেন তাঁহাকে এখানে এক বৎসর ও যিনি ড্রিল-মাষ্টার হইবেন তাঁহাকে ছয় মাস শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

Physical Culture Associationএ বড় বড় লোক সব কর্ত্তৃ-পক্ষের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন; যথা, সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি।

কলিকাতা কর্পোরেশন ব্যায়ামশালা নির্ম্মাণের জন্য ইঁহাদিগকে ৯৯ বৎসরের মেয়াদে হ্যালিডে পার্কের সঙ্গে ১২ কাঠা ১৩ ছটাক জমি দিয়াছেন। এখানে Central University থাকিবে; সমগ্র বঙ্গে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী পদ্ধতিতে কার্য্য হইবে।

সরকারী ব্যায়াম-বিদ্যালয়

এইখানে একটা কথা। অল্প কিছু দিন হইল, বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ষ্টেপলটনের আমন্ত্রণে বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দিন বালীগঞ্জে একটি সরকারী ব্যায়ামশালার উদ্বোধন করিয়াছেন। সরকারী ব্যায়াম-পরিচালক মিঃ বুকাননের তত্ত্বাবধানে এই ব্যায়ামশালার কার্য্য পরিচালিত হইবে। এখানে ব্যায়াম শিক্ষক প্রস্তুত করা হইবে। গ্রাজুয়েটগণ এখানে শিক্ষালাভ করিয়া ব্যায়ামবীর তৈয়ার হইবেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটা যুগান্তর ঘটাইতেছেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদিগকে যাবতীয় শিক্ষনীয় বিষয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত অপর সমুদয় বিষয়ের পরীক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় দেওয়া চলিবে এবং দিতে হইবেও। সেই সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামপটুত্ব সম্বন্ধেও গোড়ায় একটা পরীক্ষা করা হইবে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে ছাত্রেরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবে। ব্যায়াম-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া চলিবে না। এই নিয়ম হওয়াতে স্কুলের ছাত্রদিগকে পড়াশুনার ন্যায় নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক পড়াইবার জন্য যেরূপ শিক্ষকগণ নিযুক্ত থাকেন, ব্যায়াম-শিক্ষা দিবার জন্যও সেইরূপ প্রত্যেক স্কুলে একজন বা একাধিক ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুলে ব্যায়াম ও ড্রিল শিক্ষা দিবার নিয়ম ও অল্পস্বল্প ব্যবস্থা অনেক দিন হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম না থাকায় সকল স্কুলেই ব্যায়াম-শিক্ষার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত ছিল না—ব্যায়াম-শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা

তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিলেন না—তাঁহাদের বেতনও অতি সামান্য ছিল। মোট কথা, স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যাপারটা বেগারঠেলা গোছের ছিল। এখন পাকা রকমের বন্দোবস্ত হইতে চলিল। এখন উত্তমরূপে সুশিক্ষিত ব্যায়াম-শিক্ষক না হইলে চলিবে না। বাঙ্গালায় স্কুলের সংখ্যা কম নয়। সেইজন্য সকল স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে অনেকগুলি উচ্চ শিক্ষিত ব্যায়াম-শিক্ষক চাই। সরকারী ব্যায়াম-শিক্ষার কেন্দ্রে মিঃ বুকাননের শিক্ষাধীনে এইরূপ ব্যায়াম-শিক্ষক তৈয়াব হইবেন। ইতিমধ্যেই একশত জন ব্যায়াম শিক্ষক-তৈয়ার হইতেছেন, ক্রমে আরও হইবেন। সরকারী ব্যায়ামশালায় এবং রাজেনবাবুর প্রতিষ্ঠিত ব্যায়াম-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকগণ স্কুলগুলিতে ব্যায়াম শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলে এবং নিয়মিতভাবে কার্য্য পরিচালিত হইলে স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শরীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে রাজেনবাবুর উপদেশ

প্রকৃতি অনুযায়ী শ্বাস-প্রশ্বাস—যাহা নিজে করিতে কষ্ট না হয়—এরূপ ব্যায়াম করা বিধেয়। খাদ্য সম্বন্ধে নিয়ম এই—যাহা সহজে জীর্ণ হয় তাহাই গ্রহণীয়—তাহাতেই শরীরের পুষ্টি হয়।

অভিভাবকরা ছেলেদের পড়াশুনার এবং নৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যায়াম সম্বন্ধে তেমন কিছুই করেন না। ব্যায়ামের দ্বারা ছেলেদের দেহ যাহাতে সবল, দৃঢ়, মাংসল হয়, তাহার ব্যবস্থা প্রত্যেক অভিভাবকের করা উচিত। শরীর সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম না থাকিলে জগতের কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায় না। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে মন সুস্থ থাকে না; মন সংযত না থাকিলে নৈতিক চরিত্র পবিত্র থাকে না। ব্যায়াম করিতে গেলে সংযমী হওয়া

দরকার; সংযমী হইতে গেলেও গায়ে জোর থাকা চাই; সেইজন্য ব্যায়াম করা দরকার। সাধু-সন্ন্যাসীরাও সংযমী থাকিবার জন্য নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করেন। কেবল ব্রহ্মচারীরা ও যোগীরা অন্য প্রক্রিয়ায় ব্যায়ামের উদ্দেশ্য সাধন করেন।

রাজেনবাবু বলেন, "অনেকের ধারণা—যাহারা ব্যায়াম করে, তাহারা প্রায় গুণ্ডা হয়।" রাজেনবাবু স্বীকার করেন, আগে অনেকে এই রকম গুণ্ডামি করিত। অনেকে গুণ্ডামি করিবার জন্যই ব্যায়াম করিত, এবং গুণ্ডামি বাহাদুরীর কাজ বলিয়া মনে করিত। এখনও দুই একজন এইরূপ প্রকৃতির লোক থাকিতে পারে। তবে তাহারা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোক। ভদ্রলোকদের মধ্যেও দুই একজন এমন লোক না থাকে তাহাও নয়।

অনেকে প্রথম ব্যায়াম আরম্ভ করিবার দু'তিন মাস পরে তাহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখিলে পাড়াপ্রতিবাসীরা তাহাকে বাড়াইয়া দেয়। তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার হয় যে সে মস্ত পালোয়ান। পাড়ায় কোন গোলমাল হইলে লোকে তাহার সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। ক্রমে ব্যায়ামের আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হয়। মোট কথা, পাড়ার লোকই তাহাকে গুণ্ডা করিয়া তুলে। প্রকৃত ব্যায়াম-বীররা কখনও গুণ্ডামি করেন না বা দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হন না। তাঁহারা ধীর, স্থির, গম্ভীর, চরিত্রবান, সহৃদয় ভদ্রলোক।

অনেকের ধারণা, যাহারা কুস্তি করে, তাহাদের মস্তিষ্কের চালনা হয় না। কিন্তু বিদ্বানরা কি কুস্তীগীরদের কুস্তির প্যাঁচগুলি মনে রাখিতে পারেন? তাঁহাদের যেরূপ উদ্দেশ্য—পাশ করা, বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করা, পালোয়ানরা তদ্রূপ পৈতৃক পেশা অবলম্বন করে মাত্র। বিদ্বানরা

সাধারণতঃ কুস্তির দিকে আসে না, কুস্তীগীর পালোয়ানরাও সেইরূপ বিদ্যার্জ্জনের দিকে যায় না। পালোয়ানদের কেহ কেহ dull বলিয়া অভিহিত করেন। তাহার অর্থ এই যে তাহারা সহজে উত্তেজিত হয় না। তাহারা জানে, স্বাস্থ্যই তাহাদের একমাত্র কাম্য বস্তু; সেইজন্য তাহারা পৃথিবীর আর কোন বিষয় বড় একটা গ্রাহ্য করে না। তাহাদের এই একনিষ্ঠতা নিন্দার বিষয় নয়, বরং প্রশংসারই বিষয়।

ব্যায়াম করিলে মস্তিষ্কের শক্তি কমিয়া যাইতে পারে, এমন কথাও কেহ কেহ বলেন। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহাদের সব কথাই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কারণ, অনেক ছাত্র নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিয়া পাশও করে, জলপানিও পায়। দুই একজন ফেল করিতেও পারে; তাহাদের ফেল করিবার হয় ত অন্য কারণ আছে—ব্যায়াম সেজন্য দায়ী নয়; অর্থাৎ ব্যায়াম করে বলিয়াই তাহারা ফেল করে না। কারণ, জীবনে ব্যায়াম করে নাই, এমন লোকও ত ফেল হয়।

কেহ বা বলেন, ব্যায়াম করিলে আয়ুক্ষয় হয়। এ কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না, গ্যারাণ্টিও দিতে পারিবেন না। মানুষ যখন অমর নয়, তখন ব্যায়ামকারীও একদিন না একদিন—হয় ত অকালেই—মারা যায়। তেমনি, জন্মমাত্রেই কত শিশু যে মারা যায়! ইহাদের অকালমৃত্যু কি ব্যায়াম করার ফল?

জগতে মানুষ তিনটি বিষয়ের গর্ব্ব করিতে পারে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থ। ইহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকেই প্রধান স্থান দেওয়া যায়। কারণ, স্বাস্থ্য না থাকিলে শিক্ষা বা অর্থ কোন কাজেই আসে না।

রাজেনবাবু মাছ-মাংসের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, নিরামিষ ভোজনে শরীর সুস্থ থাকে, গায়ে জোরও যথেষ্ট হয়।

ব্যায়ামসিংহ বসন্তকুমার

ব্যায়াম-বীরগণের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজকাল অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। দেশের নানা স্থানে ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিমন্ত্রের বীজ বপন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এরই মধ্যে তিনি কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠস্থ স্থান-সমূহে অনেকগুলি ব্যায়ামশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রও হইয়াছে অনেকগুলি। বহু ছাত্রকে Horizontal Bar, Parallel Bar, তারের উপর cycle চালান, Flying Trapeze, Roman Rings, শূন্যে দড়ির খেলা ও নানাবিধ কৌশল, cycleএর খেলা, দাঁত ও হাতে করিয়া লোহা বাঁকান, Motor accident, গুরুভার উত্তোলন এবং অন্যান্য ব্যায়ামক্রীড়ায় এমন শিক্ষিত করিয়াছেন যে, পেশাদার সার্কাসওয়ালাদের ভিতরও সে রকম খেলা খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

১৩১৪ সালে রথের দিন আহিরীটোলা ষষ্ঠীতলায় মাতুলালয়ে বসন্ত-কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বড়মামা স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখো-পাধ্যায় প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। বসন্তকুমারের পিতার নাম শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী। তাঁহার আদিনিবাস রাজবলহাট। নরাণাং মাতুলক্রমঃ। শৈশব হইতেই বসন্তকুমারের ব্যায়াম-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া জগতে কিরূপে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারেন ডাক্তার বসন্ত ওরফে "বাঘা-বসন্ত" তাহার অন্যতম নিদর্শন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(গলার জোরে ¾ ইঞ্চি ব্যাসের লৌহদণ্ড বাঁকাইতেছেন) ৫৬

ব্যায়ামবীর ও ব্যায়ামকুশলী ডাক্তার বসন্তকুমার

বসন্ত বাবুর বয়স যখন সবে ১০ বৎসর, তখন রাসবিহারীবাবু তাঁহাকে তাঁহার বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম-সমিতিতে লইয়া যান। দুই বৎসর মাতুলের শিক্ষাধীনে থাকিয়া উক্ত সমিতির ব্যায়াম-উৎসবে চোরবাগান-নিবাসী স্বর্গীয় বালকরাম দত্তের বাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন বসন্ত-কুমার প্রথম ব্যায়ামক্রীড়া দেখান। ঐ উৎসবে তিনি পায়ের উপর মইএর খেলা, জমির উপর ১০।১২ জন লোককে কাঁধে পিঠে করিয়া শক্তিকৌশল প্রভৃতি দেখান। এত অল্প বয়সে এই রকম খেলা কেহ কখনও করেন নাই। ইহার এক বৎসর পরে তিনি পায়ের উপর একটী ছেলেকে লোফালুফি (Foot displays) করিয়া ইহার সহিত এমন কতিপয় আশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখান যে, তাহা কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এইখান হইতেই তাঁহার জিম্‌ন্যাষ্টিকে নাম হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে তিনি আবার পায়ে করিয়া পিপা-ঘুরান, দাঁতে করিয়া গুরুভার পাথর তোলা ও অন্যান্য জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ক্রীড়ায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তৎপরে ক্রমশঃ তিনি Gymnastic ও Acrobaticএ অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়া সেগুলি আয়ত্ত করেন। তাঁহার Chinese Wall—একখানি ১৬ হাত লম্বা ও ৭ হাত চওড়া মই।—সেইটা পায়ে করিয়া ধরিয়া রাখিলে তাহার উপর ৭।৮ জন বালকের কসরৎ, কপালের উপর বাঁশ রাখিয়া তাহার উপর ২।৩ জন বালকের ব্যায়াম নৃত্য—এই অবস্থায় আবার সিঁড়ি (stair-case) দিয়া ওঠা ও নামা, Giant-catch—একটী ২২ ফিট্ উচ্চ বংশদণ্ডের উপর শায়িত একটী ১৪।১৫ বৎসরের বালককে আরও ৩।৪ ফিট্ উচ্চে শূন্যে (সর্ব্বসমেত ২৫।২৬ ফুট উচ্চে) ছুঁড়িয়া বালকটীকে লুফিয়া লওয়া, Branch-pole on

shoulder—কাঁধের উপর একটী বাঁশের উপর শাখার ন্যায় লাগান একটী মইএর শেষভাগে একটী দোলায় দুইজনের খেলা। শায়িত অবস্থায় পায়ের উপরে একটী ২০ ফিট্ লম্বা মইএর উপরিভাগে অবস্থিত একটী লোককে শূন্যে ছুঁড়িয়া পায়ে করিয়া লুফিয়া লওয়া, ব্যায়াম ও সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে নানাপ্রকার অভিনব ক্রীড়া, চোখে রুমাল বাঁধিয়া পা ও হাতের উপর ভারকেন্দ্রের সাম্য ভাব, দ্বৈত-ব্যায়াম (Dual Herculean games), Feet-juggling প্রভৃতি ক্রীড়াগুলি তাঁহার বিশিষ্টতা। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ঐ সময়ে তিনি "জিম্ন্যাষ্টিক্ কিং" (Gymnastic king) উপাধিতে বিভূষিত হন। তাঁহার নিজ উদ্ভাবিত চিত্তচমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক ক্রীড়া দেখিয়া Sir P. C. Roy ও Surgeon-general Wilson বলিয়াছিলেন, "It requires a great science—The unique combination of muscles and brain control is its foundation."—অর্থাৎ ইহা রীতিমত বৈজ্ঞানিক ব্যাপার ; মস্তিষ্ক ও মাংসপেশীর সংযম ইহার ভিত্তি। ইহা ছাড়া বসন্তকুমার Chinese-juggling অর্থাৎ চীন-দেশীয় হস্তক্রীড়া, তীরের খেলা, ছোরার লক্ষ্যক্রীড়া, বন্দুকের লক্ষ্যক্রীড়া প্রভৃতিতেও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ভিতর এসব খেলাও খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাক্তার বসন্তকুমারের বাহুবল ও ব্যায়াম-কৌশল

বয়স যখন ১৫ বৎসর মাত্র তখন তিনি একখানি চলন্ত মোটরগাড়ীর গতিরোধ, দাঁতে ও ঘাড়ে করিয়া লোহার শিকল ছিন্ন করা, পিঠে করিয়া গুরুভার বহন ইত্যাদি করিতেন। বয়স যখন ১৬ বৎসর মাত্র তখন তিনি ঘাড় ও উরুর উপর দিয়া এক সঙ্গে দুইখানি লোকসহ চলন্ত মোটর গাড়ী লইয়াছিলেন।

তখন তিনি Medical Instituteএর ছাত্র। Medical Institute এর একটী functionএ নাট্যমন্দিরে তিনি প্রথম একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকৃতি পাথর বুকে তোলেন। তার পরেই "বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম-সমিতি"র বার্ষিক উৎসবে বুকের উপর ঐ পাথর রাখিয়া তাহার উপর ৫।৬ জন লোক নানারূপ কসরৎ করেন এবং শেষে ঐ পাথরের উপর আর একখানি ছোট পাথর (৮ ইঞ্চি × ১॥ ফুট) রাখিয়া তাহার উপর দুইজন ব্যক্তি অনবরত হাতুড়ির ঘা মারিয়া উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। ঐ দিনই তিনি প্রথম মাথায় পাথর ভাঙ্গা দেখান। খালি মাথার উপর একখানি ৬।৭ মণ পাথর রাখিয়া তাহার উপর আর একখানি ছোট পাথর রাখিলে দুইজন লোক প্রায় ২ মিনিট যাবৎ সজোরে হাতুড়ি মারিতে লাগিল। ছোট পাথরখানি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বসন্তকুমার অম্লান বদনে তাহা সহ্য করিলেন। ঐ উৎসবে সভাপতি ছিলেন Sir Charles Tegart। Tegart সাহেব এই সব খেলা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বসন্তকুমারকে "Indian Lion" বলিয়া সম্বোধন করিয়া করমর্দ্দন করেন। বসন্তকুমারের আরও কতিপয় বৈজ্ঞানিক জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ক্রীড়া দেখিয়া Tegart সাহেব তাঁহাকে "Balance-Marvel" বলিয়াছিলেন। তৎপরে দিন দিন তিনি শক্তি-ক্রীড়ায় অসামান্য ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার রোমাঞ্চকর খেলা শিখিয়া অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। খুব ভারী প্রকাণ্ড কামানের গোলা শূন্যে ছুড়িয়া তাহা ঘাড়ে ও পিঠে লওয়া, দাঁতে করিয়া টাট্টু (Pony) তোলা, পায়ে করিয়া "Human bridge" (প্রায় ১॥ টন্) বহন ইত্যাদিতে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান।

Calcutta Medical Instituteএর কতিপয় অনুষ্ঠানে তাঁহার লোমহর্ষণ ও অদ্বিতীয় ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখিয়া Sir Kailash Bose,

Dr. Urquhart, Prof M. M. Bose প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে "The Great Herculis of Bengal" উপাধিতে বিভূষিত করেন।

ইং ১৯২৯ সালের March মাসে (বোধ হয় ৫ই March), Oriental Seminaryর শত বার্ষিক উৎসবে রাজা-মহারাজা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং Sir Stanley Jackson ও Lady Jackson এর সমক্ষে ডাক্তার বসন্ত কতিপয় অভাবনীয় ও অসীম শক্তি-পরিচায়ক খেলা দেখান। ঐ দিন তিনি সূচ্যগ্রের ন্যায় সরু সরু কাঁটার বিছানার উপর শুইয়া খালি বুকের উপর দুই টন্ ভার বহন করিয়াছিলেন। Sir Stanley Jackson তাঁহার খেলা দেখিয়া এত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বসন্তকুমারকে "The 8th Wonder of the World" বলিয়া প্রশংসিত করেন।

সার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে কলিকাতাস্থ 'কমলা ইনিষ্টিটিউট্' কর্ত্তৃক তাঁহাকে একটী সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। ঐ দিন (5th of January, 1930) বসন্তকুমার দুইটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকগণকে স্তম্ভিত করেন।

ভূমিতে শয়ন করিয়া তিনি খালি বুকের উপর এবং ভাঙ্গা কাঁচের উপর হাত রাখিয়া তাহার উপর দুইটা প্রকাণ্ড Road Roller ও ১৪০ জন লোকসহ দুইখানি প্রকাণ্ড মহিষগাড়ী তোলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। এই বয়সেই তিনি ৩১২ মণ Passing weight এবং প্রায় ১২০ মণ Resting weight বুকে তুলিতে পারিয়াছিলেন।

গত বৎসর ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার একটী "রয়েল বেঙ্গল" ব্যাঘ্রের সহিত নিরস্ত্র যুদ্ধ সকলকেই চমকিত করিয়াছে। যদিও এই যুদ্ধটা সাধারণের সমক্ষে হয় নাই তত্রাচ ইহা ভয়ানক রকমের হইয়া-

ছিল। প্রায় ৪।৫ মিনিট তুমুল যুদ্ধের পর মর্ম্মস্থানে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই বৃহৎ বন্য পশুটী সম্পূর্ণ পরাজিত ও বশীভূত হইয়া নিজ খাঁচায় পলায়ন করিল। তথায় পিছন ফিরিয়া বসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল, আর বাহির হইল নাই।

সম্প্রতি প্রদর্শিত কতিপয় Record featsএর বিবরণী

(ক) গত ২৫শে শুক্রবার Good Fridayর দিন ঢাকুরিয়া Health and Childwelfare Exhibitionএ ডাঃ বসন্ত কতিপয় Record feats দেখান। চেত্‌লার জমিদার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য সভাপতি ছিলেন এবং ডাক্তার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, Health officer, District IV, Calcutta Corporation, time record করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত খেলাগুলি এখানে দেখান হয়ঃ—

১। মাথায় পাথর ভাঙ্গা—দুইজন দর্শক হাতুড়ির ঘা মারিয়া পাথরখানি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন।

২। ভূমিতে সাঁকোর আকারে শুইয়া হাতে করিয়া ৪০২ পাউণ্ড তুলিয়াছিলেন এবং উহা ১৫ সেকেণ্ড বহন করিয়াছিলেন।

৩। দুইখানি চেয়ারের অগ্রভাগে কেবল মাত্র ঘাড় ও গোড়ালি রাখিয়া সর্ব্বশরীর শূন্যে রাখিয়া বুকের উপর ২০০০ পাউণ্ড গুরুভার ১২ সেকেণ্ড যাবৎ রাখিয়াছিলেন। শূন্যে বুকের উপর (এইভাবে) তিনি প্রকাণ্ড পাথর রাখিয়া ভাঙ্গিয়াছিলেন। ইহা তিনি ১৯৩০ সালে শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুর সামনে করিয়াছিলেন।

৪। পায়ে করিয়া একখানি ভারী তক্তার উপর একখানি ছোট পাথর ও ১০ জন লোক তোলা ও তাহা ৭০ সেকেণ্ড যাবৎ বহন করা। মোট ওজন তুলিয়াছিলেন ১,০২০ পাউণ্ড। পা সোজা রাখিয়া তাহার

উপর তিনি ১।২ টন্ ওজন বহন করিতে পারিতেন। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়াম বীর Prof. Dinshaw Mistry পায়ে করিয়া ৭১৫ পাউণ্ড তুলিয়াছিলেন এবং উহা ৬২ সেকেণ্ড বহন করিয়াছিলেন।

৫। "Human Arch" এর উপর একজন পিয়ানো বাদক ও ৬ জন বন্ধুকে ধারণ করা। ।ওজন হইয়াছিল ৮৬৪ পাউণ্ড এবং ২৫ সেকেণ্ড বহন করিয়াছিলেন।

(খ) গত ১৩ই মে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের উদ্যোগে চন্দননগরে তিনি কতিপয় অমানুষিক ক্রীড়া দেখান। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নানারূপ শারীরিক কসরতের পর বসন্তবাবু ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি একখানি মহিষ গাড়ী গলার উপর দিয়া চালান। তৎপরে ঐ দিনই অধিক রাত্রে দুইখানি মোটর বাস্ (একখানি ৩৫ জন লোক ও একখানি ২৫ জন লোক বসিবার উপযোগী) ও একখানি বড় Buick গাড়ীর একসঙ্গে গতিরোধ করেন। গাড়ী তিনখানি একই দিকে পূর্ণবেগে দৌড়াইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু বসন্তকুমারের শক্তির কাছে তাহারা পরাজিত হয়,—পুনঃ পুনঃ ঝাঁকুনি দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ীর গতি বসন্তকুমারকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

(গ) গত ৫ই জুন সকালবেলা কলিকাতা করপোরেশনের ৩নং ডিষ্ট্রিক্টের হেলথ অফিসার ডাক্তার জ্ঞান চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে ডাক্তার বসন্ত কতিপয় অভিনব শক্তিক্রীড়া দেখান।

১। একটী আধ ইঞ্চি লৌহদণ্ড মাথায় মারিয়া বাঁকাইয়া ফেলেন।

২। শরীরের বিভিন্ন অংশে এবং শেষে খালি হাতের (হাতটী তখন ভাঙ্গা কাঁচের উপর ছিল) উপর বড়'ছেনি'(chisel) রাখিয়া তাহার উপর উপর্য্যুপরি হাতুড়ির ঘা মারা হয়। Medical College Hospitalএর Surgeon Dr. U.N. Roy Chowdhury নিজে হাতুড়ি মারেন।

৩। কাহারও সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র গলার কোমল অংশের সাহায্যে একটী পৌনে এক ইঞ্চি (¾th of an inch in diameter) iron rod বাঁকান। Rodটীর এক অগ্রভাগ Dr. Roy Choudhury নিজে বসন্ত বাবুর গলার অস্থিহীন কোমল অংশে (Just below the Hyoid bone) লাগাইয়া দেন এবং অপর শেষভাগটী গাছের গুঁড়িতে লাগাইয়া দেন। বসন্তকুমার কিছুক্ষণ হঠযোগ সাধনা করিয়া iron rodটি অবলীলাক্রমে ঠেলিয়া বাঁকাইয়া দেন; মোটেই হাত লাগান নাই।

৪। চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ হঠযোগের পর গলা স্ফীত ও সীসার ন্যায় শক্ত করিলে সেই উন্মুক্ত গলা দুইজনে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি অনায়াসে তাহা সহ্য করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ দত্ত (Captain of the Mohonbagan club) এবং আর একজন বলশালী যুবক সজোরে গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন।

(ঘ) গত ৫ই জুন সন্ধ্যার সময় হাওড়া জিম্ন্যাসিয়ামে আবার তিনটী Record feats দেখান—

১। একটী নূতন Tennis ball হাতে করিয়া ছিন্ন করণ।

২। কভার সহ দুই প্যাকেট তাস একসঙ্গে হাতে করিয়া ছিন্ন করণ।

৩। ঘাড় ও গোড়ালি চেয়ারে রাখিয়া শূন্যে অবস্থিত বুকের উপর একটী প্রকাণ্ড Joist ধরিলে ১২ জন লোক ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিয়া তাহা ধনুকাকারে বাঁকাইয়া ফেলেন।

(ঙ) সম্প্রতি (৮ই জুন) তাঁহার পুরাতন ডাক্তার বন্ধুদিগকে আপ্যায়িত করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রীড়াগুলি দেখান—

১। একটী Jail handcuff এবং একটী ঘোড়ার খুর ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

২। কেবল মাথায় মারিয়া একসঙ্গে ৫ খানি টালি ভাঙ্গেন।

৩। একটী আধ ইঞ্চি মোটা এবং ১॥০ ফুট লম্বা iron rod এর অগ্রভাগদ্বয় খালি হাতের (forearmএর) উপর রাখিয়া চাপ্ দিয়া বাঁকাইয়া ফেলেন।

৪। সামনে হইতে ঠেলিয়া একখানি চলন্ত Motor-Bus এর গতিরোধ করেন।

স্বাস্থ্যগুরু ডাক্তার বসন্তকুমার কেবল নিজে শরীর-চর্চ্চা করিয়া নিরস্ত নহেন। দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিবার তাঁহার প্রগাঢ় ইচ্ছা। তিনি প্রায়ই দেশীয় ও বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ পত্রিকাসমূহে শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। প্রায়ই নিজ উদ্ভাবিত তথ্যসমূহের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়া থাকেন। দেশবিদেশের স্বাস্থ্যকামী নরনারী তাঁহার নীতিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত; তাই তাঁহারা তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ব্যায়াম-পদ্ধতি এখন "বসন্ত-পদ্ধতি" (Science of Basantoism) বলিয়া পরিচিত।

বসন্তকুমার কখনও নিজ শক্তির অপব্যবহার করেন না। পথি-মধ্যস্থ বিপদগ্রস্তকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি অনেক সময় শক্তির সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। কেবলমাত্র দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

তখন তিনি Mayo Hospitalএর Duty Student, প্রায় ১টার সময় কতিপয় কলেজের বন্ধুর সঙ্গে পোস্তার রাস্তা দিয়া বাড়ী ফিরিতে-ছেন, এমন সময় একটা "হল্লা" উঠে। পিছন দিকে তাকাইয়া দেখেন, একটী অতিকায় পাগলা ষাঁড় রাস্তার লোককে আক্রমণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই ষাঁড়টা বসন্তবাবুর নিকটস্থ একটি ছোট ছেলেকে আক্রমণ করে। হাতে Dressing case ও Stethoscope ছিল—

তাহা তৎক্ষণাৎ রাস্তার উপর ফেলিয়া দিয়া বীরযুবক বসন্ত ষাঁড়ের শিং দুইটী ধরিলেন। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সেই বৃহদাকার ষাঁড়টীকে ভূতলশায়ী করিলেন। ষাঁড়টা ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পথের লোক নিরাপদে পথ চলিতে লাগিল।

আর একদিন অধিক রাত্রে উত্তরপাড়া হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। রাস্তায় একটী গোলযোগ দেখিয়া সেইখানে গিয়া দেখেন, একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ঘেরিয়া কতিপয় নিম্নশ্রেণীর লোক মারিবার উপক্রম করিতেছে। বসন্তবাবু তাহাদের একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি অতি অশ্লীল ভাষায় তার জবাব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটী ঘুষির দ্বারা তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় ১০০ লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে। একজন কাটারি লইয়া মারিতে আসিলে বসন্তবাবু তাহাকে এমন যুযুৎসুর প্যাঁচ্ মারিলেন যে সে ব্যক্তি ধরাশায়ী হইল, আর উঠিতে পারিল না। তারপর কিল্, চড়, লাথি, ঘুষির দ্বারা অনেককে জখম করিলেন। এই সময়ে একজন দুষ্ট তাঁহাকে পাছায় লাথি মারিলে তিনি তাহার ঘাড় ও কোমরের কাপড় ধরিয়া পুটলীর মত করিয়া নিকটস্থ ডোবায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। ইহা দেখিয়া দস্যুদল পলায়ন করে। পরে অজ্ঞানাবস্থায় শায়িত সেই অসহায় ব্যক্তিকে শিশুর মত কোলে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া আসেন। নিজে শুশ্রূষা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

তরুণের অভ্যুদয়

বাঙ্গালার যাঁহারা আশা-ভরসা, যাঁহারা ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতি গঠন করিবেন, তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সূচনা দেখিয়া মনে যে আনন্দরসের সঞ্চার হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। তরুণদল চিরদিনই সকল দেশেই জাতিগঠনের কাজ করিয়া আসিতেছেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে তরুণদলই দেশের প্রাণশক্তি ছিল। দেশের ও জাতির যত হিত কাজ সে সবই তাঁহাদের উদ্যমের ফলে সাধিত হইত। জানি না কাহার যাদুদণ্ড-স্পর্শে, কি মোহমন্ত্রে তাহারা মধ্যযুগে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, জড়বৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার কাহার সোণার কাঠির স্পর্শে এখন আবার দেশের সকল কাজেই তরুণদলকে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। দুর্ভিক্ষে, জল-প্লাবনে, আর্ত্তত্রাণে তাহারাই তাহাদের অশিক্ষিত সেবাপরায়ণ বাহু বিস্তার করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

শ্রীমান বিষ্ণুচরণ ঘোষ

তরুণদলই জাতির শক্তির মেরুদণ্ড। তরুণ-সম্প্রদায়ের দেহ ক্ষীণ, দুর্ব্বল থাকিলে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহা উপলব্ধি করিয়াই তরুণ-সম্প্রদায়ে শরীরচর্চ্চা করিয়া শক্তি অর্জ্জনের জন্য একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তরুণের প্রাণে এই সাড়া কে জাগাইল? তিনি আর কেহ নহেন—কলিকাতার সিটি কলেজ ও ইউনিভার্সিটি কলেজ-

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষ বি-এল
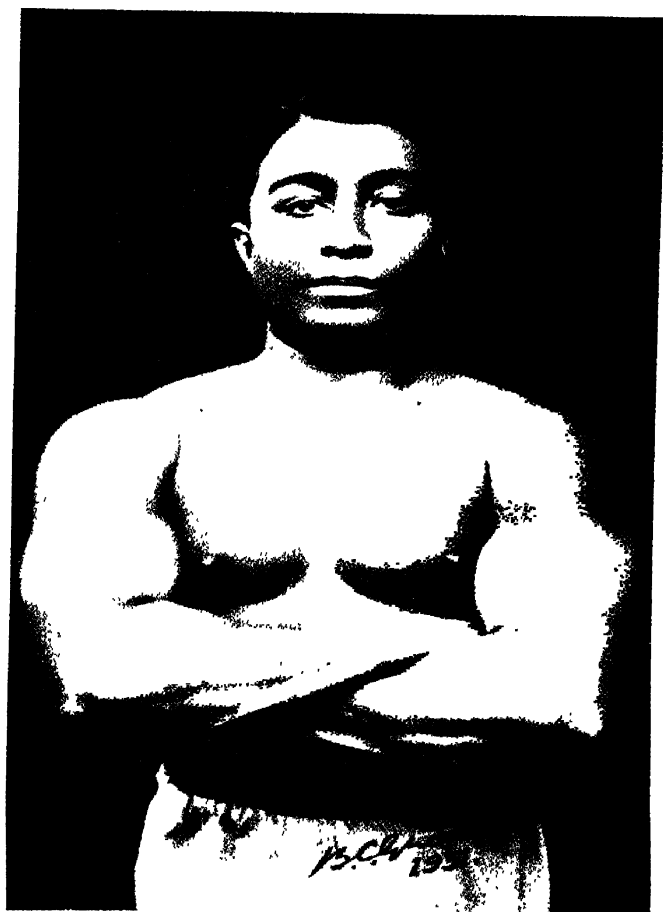
হোষ্টেলের ব্যায়াম-শিক্ষক প্রোফেসর রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ-ঠাকুরতা। একদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি অধ্যবসায়বলে নিজের শরীরকে যেরূপ তৈয়ার করিয়াছেন,—তরুণ দলকেও ঠিক সেইভাবে তৈয়ার করিয়া দিবেন। এই প্রতিজ্ঞা তিনি কিরূপে পালন করিয়াছেন—কতকগুলি তরুণকে কি ভাবে তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, আজ তাহারই একটু পরিচয় লইব।

রাজেনবাবুর তৈয়ারী-করা তরুণদলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে যাঁহার নাম করিতে হয় তিনি শ্রীমান বিষ্ণুচরণ ঘোষ বি-এসসি, বি-এল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল-সমিতির তরফ হইতে বিষ্ণুবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। পরীক্ষার ফলে জানা যায়—তিনি অতি দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় বালক; তাঁহার ওজন ৬৮ পাউণ্ড (প্রায় ৩৪ সের—পূরা এক মণও নয়); আর বক্ষের পরিধি পঁচিশ ইঞ্চি মাত্র। তিনি তখন ডান হাতে ১০ সের আর বাম হাতে মাত্র ৯ সের ভারী জিনিস আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেন—ইহার বেশী নয়।

আই-এসসি পরীক্ষা দিবার পর তিনি প্রোফেসর ঠাকুরতার উপদেশে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিন মাসের মধ্যেই আশ্চর্য্য রকমের পরিবর্ত্তন দেখা গেল—তাঁহার বক্ষের পরিধি বাড়িয়া ৩৪ ইঞ্চি হইল, এবং ওজনও বাড়িয়া হইল ১ মণ ১০ সের। ইহার পর তিনি শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িতে গেলেন। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে লোহা পিটিয়া বিদ্যা শিখিতে হয়—দুর্ব্বল বালকদের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা জানি, অনেক ছেলে অনেক আশা-ভরসা লইয়া এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িতে যায়; কিন্তু সেখানকার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সহ্য করিতে না পারিয়া দুই-চারি মাসের মধ্যেই

অনেকে পলাইয়া আসে। কাজেই, বেশ বুঝা যায় যে, গায়ে রীতিমত জোর না থাকিলে, শরীর বেশ শক্ত-সমর্থ না হইলে, এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষও সেইজন্য প্রবেশার্থী ছাত্রকে ভর্ত্তি করিবার পূর্ব্বে একবার বেশ করিয়া বাজাইয়া লন। বিষ্ণুবাবু এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইতে গেলে, তাঁহাকেও ঐভাবে বাজাইয়া লওয়া হইয়াছিল। পরীক্ষার পর কর্ত্তৃপক্ষ মত প্রকাশ করেন যে, তাঁহার শরীরের অবস্থা মন্দ নয় (tolerably strong); কলেজের পরিশ্রম তাঁহার সহ্য হইতেও পারে। বিষ্ণুবাবু যে তিন মাস পূর্ব্বেও রিকেট রোগগ্রস্ত রোগা-পটকা বালক ছিলেন, কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা তাহা ধরিতে পারেন নাই।

শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে থাকিতে, সেখানে যখনই কোন উৎসব ইত্যাদি হইত, তখন বিষ্ণুবাবু মাংসপেশীর সংকোচন-প্রসারণ (muscle control) দেখাইয়া উপস্থিত ভদ্রলোকদের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। তা ছাড়া, অন্যরকম বলব্যঞ্জক ক্রীড়া-কৌতুকও তিনি দেখাইতেন, যেমন, প্রায় দুই টন ওজনের রোলার বুকে লওয়া, বোঝাই গরুর গাড়ীর তলায় শুইয়া থাকা, দেহের উপর দিয়া মোটর গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইতে দেওয়া, কিম্বা একজন সাধারণ লোককে ১২ ফিট উঁচু জায়গা হইতে তাঁহার পেটের উপর লাফাইয়া পড়িতে দেওয়া, লোহার ডাণ্ডাকে বাঁকাইয়া কুণ্ডলী পাকানো, পেটের উপর প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিতে দেওয়া, প্রভৃতি। এ সমস্তই তিনি তাঁহার গুরু প্রোফেসর রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতার চরণপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন তিনি শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ছিলেন, ততদিন গুরুসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাঁহার শরীর-চর্চ্চায় ব্যাঘাত ঘটে।

কিন্তু এ সকল শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে, শৈশবকালেই, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ গিরি বি-এ'র নিকট মাংসপেশীর সংকোচন প্রসারণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামীজী শরীর-চর্চ্চার যোগাদ্যা পদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি এখন আমেরিকায় আছেন, এবং বিগত দ্বাদশ বর্ষকাল ধরিয়া আমেরিকানদিগকে তাঁহার পদ্ধতি অনুযায়ী শরীর-চর্চ্চা করিতে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। স্বামীজী যখন এখানে ছিলেন, বিষ্ণু বাবু তখন খুব ছোট—ছেলেমানুষ আর রোগা ছিলেন। তিনি তখন মাংসপেশী-সংকোচন অভ্যাস করিতে রাজী হইতেন না। কিন্তু ঠাকুরতা মহাশয়ের পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিয়া তাঁহার চেহারা ফিরিতে আরম্ভ করিলে, তিনি একদিন মিঃ চিট টুনকে তাঁহার প্রকাণ্ড সুগঠিত মাংসপেশী সংকোচন করিতে দেখিলেন। মিঃ চিট টুন তখন বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া দর্শকগণ বিস্ময়ে করতালি দিয়া উঠিল। বিষ্ণু বাবু জানিতেন যে তিনিও ঐরূপ করিতে পারেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে তাঁহার মাংসপেশীগুলি মিঃ চিট টুনের মতন সবল, সুপরিণত নহে। মাংসপেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ দেখাইয়া লোকের কাছে বাহবা পাইতে হইলে সেগুলি আরও বড় ও সুপুষ্ট হওয়া চাই।

তখন হইতে তিনি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতে এবং স্বামীজীর পদ্ধতিতে পুনরায় মাংসপেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলও একেবারে হাতে হাতে ফলিল—তাঁহার মাংস-পেশী বড় ও সুপুষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে সেগুলি সুপরিণত ও সুগঠিত হইয়া আসিতে লাগিল এবং শক্তি-প্রয়োগের ক্ষমতাও বাড়িতে লাগিল। মাস তিনেকের মধ্যেই তিনি তাঁহার মাংসপেশীগুলিকে এমন আজ্ঞাবহ করিয়া তুলিলেন যে, প্রোফেসর ঠাকুরতা এবং বিষ্ণু বাবুর বন্ধুরা তাঁহাকে

পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন যে, লোকের কাছে তাঁহার এই ক্ষমতা দেখাইতে হইবে।

প্রথম যেদিন তিনি সাধারণ সভায় প্রকাশ্যে তাঁহার মাংসপেশীর সংকোচন প্রসারণ দেখাইলেন, সেদিন ঢাকা অঞ্চলের একজন জমিদার—লালু বাবু তাঁহাকে একটি পদক পুরস্কার দিলেন। লালু বাবু পুরস্কার দিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু বাবুকে কতখানি উৎসাহ দিলেন তাহা বোধ হয় তিনি জানিতে পারিলেন না।

মাংসপেশী সঞ্চালন করিতে অভ্যাস করিলে সেগুলি সুপরিণত হয় আর শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণু বাবুর ধারণা, এটি ব্যায়ামের দ্বিতীয় অবস্থা ; কারণ, তৎপূর্ব্বে সাধারণ ব্যায়ামের দ্বারা মাংসপেশীগুলির আকার বড় করিয়া লওয়া চাই। কি করিয়া এই দুইটি কাজ করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য বিষ্ণু বাবু ও তাঁহার বন্ধু মিঃ কে. সি. সেনগুপ্ত দুজনে মিলিয়া বয়স্ক যুবকদের পড়িবার জন্য ইংরেজীতে একখানি বই ছাপাইয়াছেন। তাহাতে অনেক ছবি দিয়া এই ধরণের ব্যায়ামের পদ্ধতি তাঁহারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বিষ্ণু বাবু তাঁহার শরীরটিকে এমন করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন যে, যুবক-মহলে তাঁহার জয় জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা আর ধরে না। পদক যে তিনি কত পাইয়াছেন তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। তিনি এখন তরুণদের তাঁহার পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিতে শিক্ষা দিয়া তাহাদের তৈয়ার করিতেছেন। তাঁহার পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিয়া কত রোগা ছেলেদের ইয়া ষণ্ডা চেহারা হইতেছে তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

বিষ্ণু বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে গত ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩২, বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—Physical
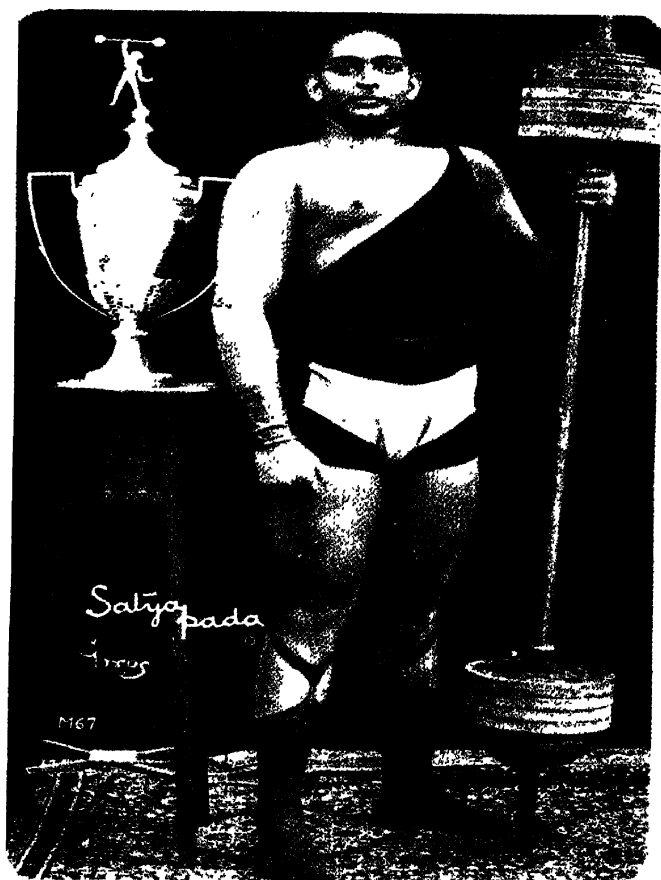
৺ সত্যপদ ভট্টাচার্য্য

Education Collegeএ শিক্ষালাভ করা এবং নিজের বিদ্যা muscle controlling প্রচার করা। কার্য্যসিদ্ধি করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমেরিকাতে বিষ্ণু বাবুর মধ্যম ভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ গিরি যোগাত্মা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, এবং আমেরিকার নানা স্থানে স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য প্রায় এক শতটি কলেজ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমান সত্যপদ ভট্টাচার্য্য বি-এসসি

আমাদের অনুরোধে শ্রীমান সত্যপদ তাঁহার শরীর-চর্চ্চার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন—

আমি একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তান। অত্যন্ত অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় নানারকম দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করিয়া পাঁচজনের সাহায্যে আমি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করি। যখন আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন ১নং ঝামাপুকুর লেন স্থিত রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীর free boardingএ ভর্ত্তি হই এবং তখন হইতে ঐ free boardingএ থাইয়া আমি ১৯২৯ সালে B. Sc. পাশ করি। পূর্ব্বে আমার স্বাস্থ্য সাধারণ বালকদিগের মতনই ছিল—কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া Matriculation classএ পড়িতে পড়িতে আমি শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিয়া দীর্ঘ এক বৎসর কাল পরে আমি বিশেষ স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করি। Matriculation Examinationএ উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে Intermediate of Science পড়িবার সময় এক বৎসরের মধ্যে আমার ১০" বুকের মাপ বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময় আমি City College Gymnasiumএ প্রোঃ রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার অধীনে

ব্যায়াম শিক্ষা করিতাম। তার পর 2nd yearএ পড়িবার সময় আমি City College Gymnasiumএ বিষ্ণু বাবুর অধীনে Weight lifting practice করিতে আরম্ভ করি এবং ১৯২৮ সালে যখন আমি Ripon Collegeএ (Bachelor of Science) B. Sc. 3rd year class এ পড়ি, তখন All India weight lifting competitionএ সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া Sir Rajendra Challenge Trophy জয় করিয়া লইয়া আসি।

একটা কথা—সকলেই আপত্তি করেন যে শুধু ডাল ভাত খাইয়া ব্যায়াম করা যাইতে পারে না—দুধ, ঘি, বাদাম, মাংস ইত্যাদি না খাইলে ব্যায়াম করিয়া কোন ফল নাই। আমার মনে হয় এ ধারণা ভুল—কেন না আমি ছেলে বেলা হইতেই মাংস খাইতাম না। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না বলিয়া দুধ, ঘি, বাদাম ইত্যাদি খাইতে পাইতাম না। কেবল দুই বেলা দুটা ডাল ভাত খাইয়াই মানুষ হইয়াছি, এবং ইদানীং আমি নিরামিষাশী। আমার মনে হয়, ভাত ডাল খাইয়া যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে নিজেকে সংযমী করিতে হইবে।

শ্রীসত্যপদ ভট্টাচার্য্য
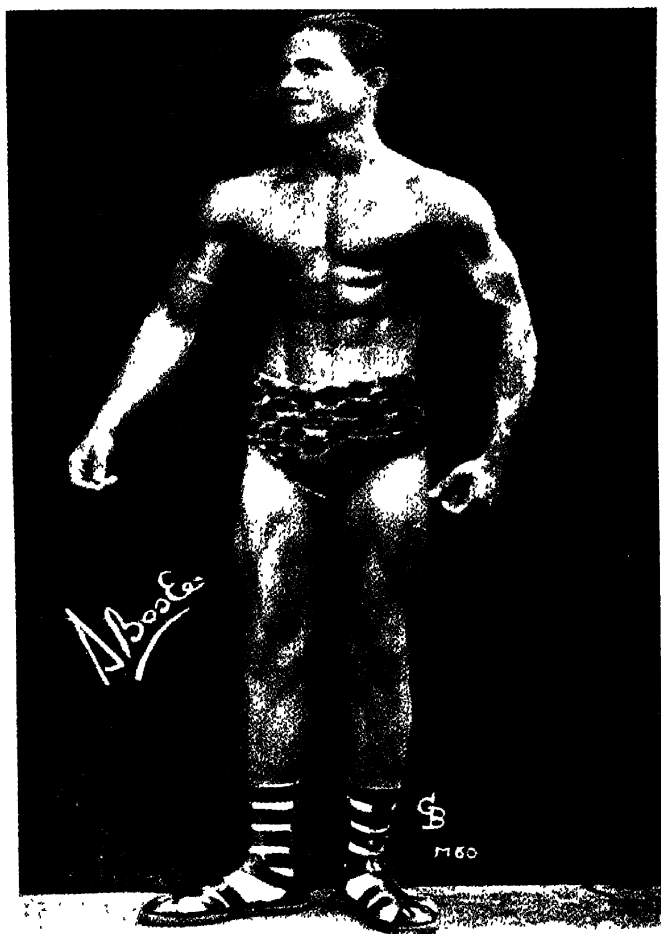
শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু

মিঃ এস. বোস

আন্তরিক উৎসাহ ও আগ্রহ থাকিলে, একলব্যের মত, কাহারও সাহায্য না লইয়াও, কিরূপে শরীর-সাধনা করিয়া সফলতা লাভ করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু। ইনি টিটাগড়ে বাস করেন। ইঁহার বয়স এখন ২২ বৎসর। ইনি মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সেকেণ্ড ইয়ার পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। ছেলেবেলায় ইনি খুব রোগা কিন্তু ডান্‌পিটে ছিলেন। মেডিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করিবার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল শরীর সাধনা করা। মেডিক্যাল স্কুলে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া ইনি শরীর-সাধনার সঙ্কেতটুকু শিখিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমে ইনি অনেকের কাছে exercise শিক্ষা করিবার জন্য যান। কিন্তু এই সকল লোকের চেহারা দেখিয়া তাঁহার পছন্দ না হওয়ায় Sandow ও Monte Saldoর ছবি ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া আর্‌সির সামনে ইনি নিজেই exercise করিতে সুরু করেন। ইঁহাকে উৎসাহ দিবার কেহই ছিল না; কিন্তু বাধা দিবার লোকের অভাব ছিল না—সকলেই তাঁহাকে দূর-ছাই করিত। এরূপ অবস্থায় বিব্রত হইয়া তিনি মধ্যে একবার বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া এক মাস যাবৎ একটি সার্কাসের সঙ্গে থাকেন। পরে আর একবার রেঙ্গুনে গিয়া প্রায় এক বৎসর কাটাইয়া আসেন। ইঁহার প্রথম নাম হয় রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনে যাইবার পূর্ব্বে ইনি muscle controlling অভ্যাস করিতেন। তাহার পর একদিন বিষ্ণু বাবু ও তাঁহার ভাগিনেয় বিজয় কুমার মল্লিকের muscle controlling দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান; এবং ভাবেন যে, না, আমি যখন muscle controlling অত ভাল পারিব না, তখন উহার চেষ্টা করা বৃথা। আমি অন্য একটা নূতন কিছু করিব। সেই

হইতে তিনি muscle posing অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং এইরূপে একটি নূতন Artএর প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদের বাঙ্গালা দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

রেঙ্গুনে ইনি muscle posing দেখাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বিষ্ণু বাবুর সহিত ইহার বন্ধুত্ব হয়। ইঁহারা দুইজনে মিলিত হইয়া বহু স্থানে মাংসপেশীর অদ্ভুত খেলা দেখাইয়া বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। বিষ্ণু বাবু এবং অন্যান্য বহু শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শরীর-সাধন ও শরীর-গঠন সম্বন্ধে ইনি তরুণ-দলের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। ইনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম দুই প্যাকেট তাস ছিঁড়িয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দেন। ইনি এক অদ্ভুত খেলা দেখান। ২০।২৫ জন লোক সমেত একটি প্রকাণ্ড মোষের গাড়ী ইনি পেটের উপর দিয়া চালাইতে পারেন —যা না কি রামমূর্ত্তি প্রভৃতি বড় বড় বীরগণ বুকের উপর দিয়া চালাইতেন। ইহার এই খেলার নকল করিতে গিয়া রেঙ্গুনে একটি ছেলে Baby Austin Motor Car পেটের উপর দিয়া চালাইতে গিয়া মারা যান। এবং সম্প্রতি বিষ্ণুবাবুর প্রিয় ছাত্র সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী (ননী) গতপূর্ব্ব বীরাষ্টমীর দিন পেটের উপর দিয়া লোকসমেত গরুর গাড়ী চালাইতে গিয়া সেই দিনই মারা যান। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সুকুমার বাবুর পেট কি সাংঘাতিক শক্ত।

সম্প্রতি ইনি Science Association হইতে passage লইয়া বিষ্ণু বাবুর Gymnasiumএর পক্ষ হইতে যুযুৎসু শিক্ষা করিবার জন্য জাপানে গিয়াছেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া আমেরিকা ও বিলাতে যাইবেন।
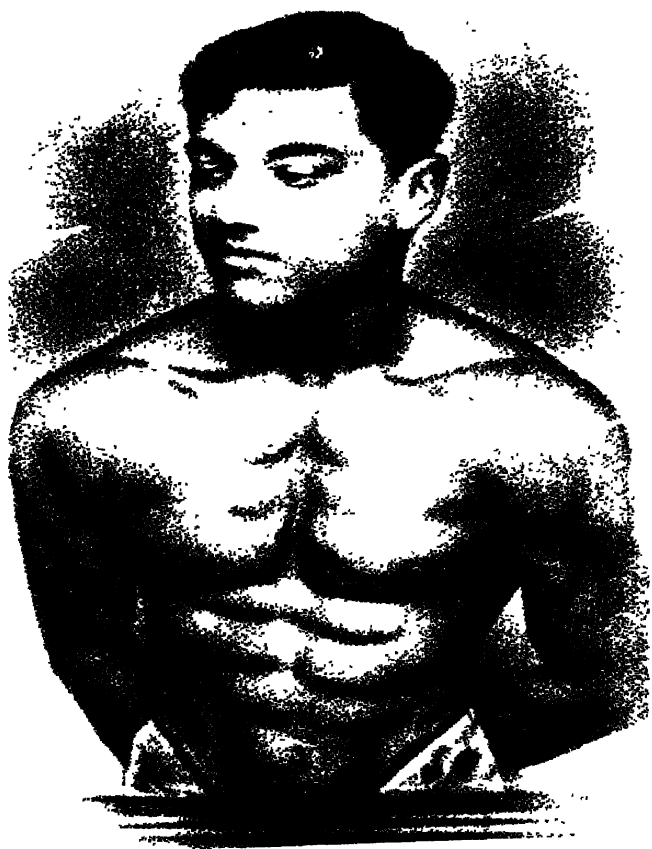
শ্রীমান চিত্তরঞ্জন দত্ত

শ্রীমান চিত্তরঞ্জন দত্ত

ইনি ষোল বৎসর বয়স হইতে ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার শরীরের ওজন ছিল ৮ ষ্টোন। ব্যায়াম আরম্ভ করিবার নয় মাস পরে ইনি Chit Tunএর সহিত দেখা করেন। এবং তাঁহার নিকট হইতে কিছু উপদেশ লইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত ব্যায়াম করিতে থাকেন। ফলে তাঁহার চেহারা ফিরিয়া যায়। তাহার পর তিনি muscle control অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন ব্যায়াম অভ্যাস করিবার পর যখন তাঁহার শরীরের ওজন দশ ষ্টোন হইল,তখন হইতে তিনি ভার উত্তোলন (weight lifting) অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত তিনি যে সকল lift অভ্যাস করেন, তাহার record এইরূপ—

১। Two hands clean and jerk—200 lbs. দুই শত পাউণ্ড ওজন ধীরে ধীরে হাতের জোরে তোলা এবং পরে ঝাঁকানি দেওয়া। ২। Two hands snatch—150 lbs. দেড় শত পাউণ্ড ওজন ঝাঁকানি দিয়া একেবারে মাথার উপর তোলা। ৩। Two hands press—170 lbs. ১৭০ পাউণ্ড ওজন বগল দাবাইয়া হাতের জোরে তোলা। ৪। Two hands military press—155 lbs. উপরের-টারই প্রকারান্তর; ইহার ওজন ১৫৫ পাউণ্ড। (Body weight—10 stones)—প্রায় একমণ ত্রিশ সের।

তিনি যে সকল feats দেখান, তাহার বিবরণ এইরূপ—

১। Iron bar curling—চ্যাপ্টা লৌহদণ্ড মুচড়াইয়া পাকাইয়া ফেলা। ২। Nail breaking and thrusting—পেরেক ভাঙ্গা ও হাতের জোরে বিদ্ধ করা। ৩। Card tearing (one packet 553) ৫৫৩ মার্কা এক জোড়া তাস ছেঁড়া। ৪। Rod bending—লৌহ দণ্ড বাঁকানো।

ইনি মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন।

শ্রীমান সতীশচন্দ্র কুকড়ী

শ্রীমান সতীশচন্দ্র কুকড়ীর জন্ম হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। ছোট বেলা হইতে পড়াশুনা অপেক্ষা ব্যায়াম-চর্চ্চার দিকেই তাহার ঝোক ছিল বেশী। স্কুলে ক্লাসে যতক্ষণ থাকিতেন, তদপেক্ষা বেশীক্ষণ থাকিতেন স্কুলের জিমন্যাষ্টিক গ্রাউণ্ডে। তখন কুস্তির চর্চ্চা এবং আখড়া প্রায় মুসলমানগণের এক্তিয়ারে ছিল। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে সতীশচন্দ্রের কুস্তি শিখিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। তখন বলিতে গেলে হিন্দুগণের কোন নামকরা কুস্তিব আখড়া ছিল না। তবে গোবরবাবুর আখড়ার নাম ক্রমশঃ প্রচারিত হইতেছিল। পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থানুসরণ করিয়া গোবরবাবু বেশ রীতিমত কুস্তির বিরাট আয়োজন করিয়া ছাত্রদের কুস্তি শিক্ষা দিতেছিলেন এবং বাঙ্গালীদিগকে কুস্তি শিক্ষার্থ আহ্বান করিতেছিলেন। বালক সতীশ গোবরবাবুর আখড়ায় গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। সেই হইল তাঁহার কুস্তি জীবনের সূচনা। ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি নিয়মমত তথায় গোবরবাবুর নিকট কুস্তি শিক্ষা করিলেন।

এক দিবস মনোমোহন থিয়েটারে ভীম ভবানী তাহার খেলা দেখান। এই সব বলব্যঞ্জক খেলা দেখিয়া সতীশবাবু উৎসাহিত হইয়া উঠেন, এবং ঐ সকল খেলা দেখাইবার তাঁহার ইচ্ছা হয়। তখন হইতে তিনি এই সকল শিক্ষা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তিনি বন্ধুদের লইয়া দল বাঁধিলেন এবং ব্যায়াম অভ্যাস করিতে লাগিলেন। হাতে পয়সা নাই—তাই একটা ভারী পাথর যোগাড় করিয়া তাহাই সকলে বুকে লইবার চেষ্টা করিতেন। ক্রমে রামবাগান ফ্রেণ্ডস ইউনাইটেড ক্লাবে গিয়া সকল বন্ধু ভারী ডাম্বেল বারবেল প্রভৃতি তুলিতে লাগিলেন। দু'দিনেই এই সকল অভ্যাস হইয়া গেল। তখন মনে হইল, ইহাই যথেষ্ট নয়—আরও চাই।

শ্রীমান সতীশচন্দ্র কুকড়ী
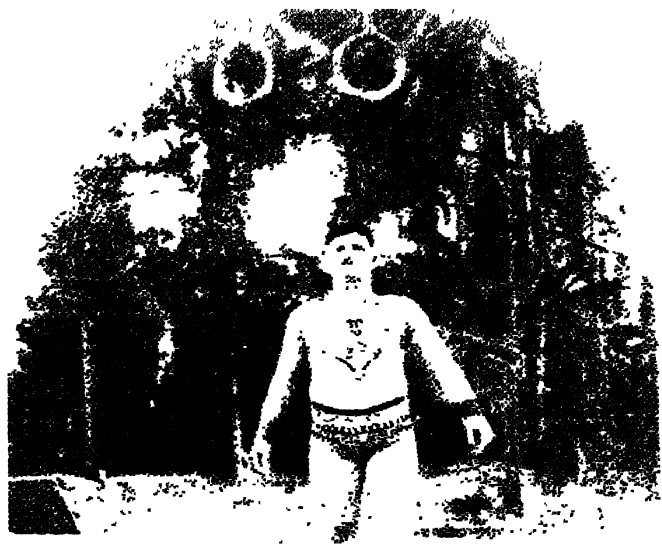
সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে এবং বন্ধুর মুখে বেণীবাবুর আখড়ার সন্ধান পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই আখড়ায় গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। এখানে তিনি নানান কাজ শিক্ষা করিলেন। গরুর গাড়ী বুকের উপর দিয়া লইয়া যাইতে দেওয়া, ভারী পাথর তোলা, লোহার বল লইয়া খেলা, জাগ্‌লিং, ভার উত্তোলন প্রভৃতি এখানে দস্তুর মত শেখা হইল।

ইহার পর দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা হইল। সেইজন্য তিনি কোন সার্কাসে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুযোগ মিলিল—তিনি কে. বসাকের সার্কাসে যোগ দিলেন। এইখানে তাঁহার সার্কাস জীবন আরম্ভ হইল। বসাকের সার্কাসে দুই তিন মাস থাকিবার পর তিনি বড়দিন উপলক্ষে আগাসীর সার্কাসে গিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন কাজ করিবার পর তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন। পরে দুই একটি সার্কাসে কাজ করিবার পর এক বন্ধুর সাহায্যে যাভায় গিয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে গিয়া ৭।৮ মাস থাকেন। ইহার পরে তিনি সেলার্স সার্কাসে কলিকাতায় খেলা দেখান। তিনি যে যে খেলা দেখাইয়া থাকেন তাহার বিবরণ—

১। এক হাতে দুই মণ ভার উত্তোলন (ঝাঁকানি না দিয়া)।

২। দুই হাতে তিন মণ পাঁচসের ভার উত্তোলন (ধীরে ধীরে)।

৩। স্কন্ধের উপর তিন মণ।

৪। এক এক হাতে এক একটি কেডলি বল—প্রত্যেকটি ১ মণ ১০ সের ওজনের—ধারণ।

৫। কামানের গোলা লইয়া লোফালুফি।

৬। পাথর ভাঙা ও ভার সহন।

৭। দেহের উপর দিয়া মোটর চালাইয়া দেওয়া ও চলন্ত মোটর থামানো।

শ্রীমান ভূপেশ কর্ম্মকার

ইঁহার বয়স এখন ২৪ বৎসর। বাড়ী ফরিদপুর জেলার পণ্ডিতসার গ্রামে। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে বর্ত্তমানে বাস করেন। সেইখানে তাঁহার জন্ম, এবং সেইখানেই এত দিন আছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার। তিনি চাঁদপুরে ডাক্তারী করেন। মহেন্দ্রবাবুর তিন পুত্র—ভূপেশ মধ্যম। অন্য দুই পুত্রের স্বাস্থ্যও ভাল।

ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুর—পুত্রদিগের স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—পড়াশুনার দিকেও অবশ্য। পল্লীর অন্য লোকদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে অভিভাবকদিগের তেমন লক্ষ্য দেখা যায় না—তাঁহারা ছেলেদের পড়াশুনার দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়া থাকেন। মহেন্দ্র বাবুর ব্যবস্থা অন্য রকম। তিনি চান যে, ছেলেরা যেমন লেখাপড়া শিখে, তাহাদের স্বাস্থ্য ও শরীরও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত উন্নতি লাভ করে। আধুনিক সাধারণ বাপ-মার ধরণই এই যে ছেলেরা বিদ্বান হয়, দশের একজন হয়; তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় হউক—সে দিকে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য থাকে না। এমন কি, সাধারণতঃ ছেলেরা বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ মাঠে ছুটাছুটি করে, শরীরচর্চ্চা করে, ইহাও তাঁহারা পছন্দ করেন না। যাহা হউক, উপযুক্ত পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁহার পুত্রগণ সকলেই ব্যায়ামচর্চ্চায় অনুরাগী। এই কারণেই ভূপেশ বাবু আজ অসাধারণ শক্তি লাভ করিয়া সৌভাগ্যবান হইয়াছেন।

বাল্যকালেই ভূপেশ বাবুর বলব্যঞ্জক খেলাধূলার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছিল। তাঁহাদের বাড়ী নদীর ধারে—প্রত্যহ অবগাহন স্নান ও সন্তরণের বিশেষ সুবিধা ছিল। স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যহ
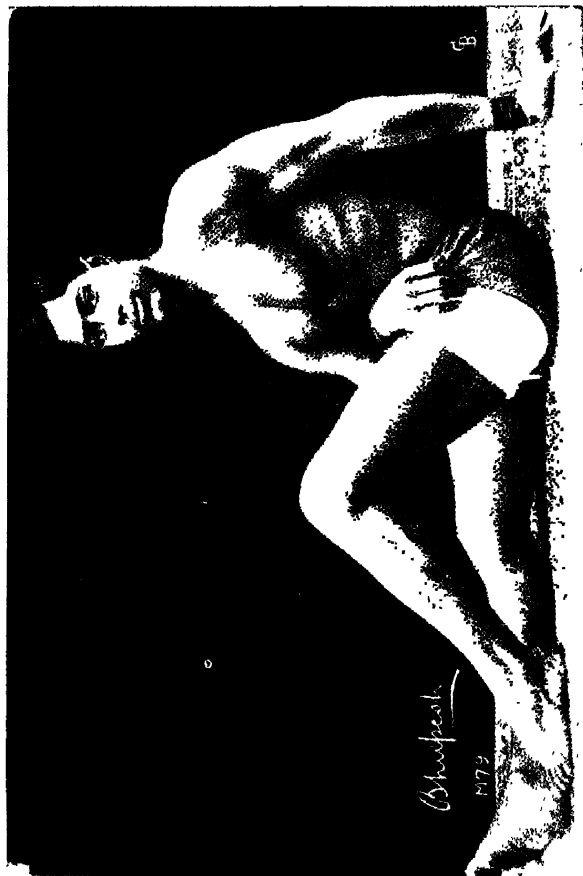
শ্রী ভূপে চন্দ্র কর্ম্মকার
কা কেল ডিকাল কলে

তাঁহারা আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত নদীতে সাঁতার কাটিতেন। ভূপেশ বাবু যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন বিশ্ববিখ্যাত রামমূর্ত্তি চাঁদপুরে তাঁহার শারীরিক শক্তির ক্রীড়া দেখাইতে যান। সেই খেলা দেখিয়া চাঁদপুরের তরুণদিগের মধ্যে সবিশেষ ভাবান্তর ঘটিল—শরীরচর্চ্চায় সকলেই অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। অনেকগুলি ক্লাব গঠিত হইল, তরুণরা মহোদ্যমে ব্যায়াম করিতে সুরু করিলেন। ভূপেশবাবু ও তাঁহার ভাইদের স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল ছিল-- তাঁহারা শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটা বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হইল—চাঁদপুরে ব্যায়াম শিখাইবার কেহ ছিল না। নিজেরাই বুদ্ধি খরচ করিয়া বুক ডন ও বৈঠক করিতেন। কাহারও উপদেশ বা সাহায্য বড় একটা পাইতেন না। একদিন বরদাকান্ত ঘোষ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ভূপেশ বাবুর আলাপ হয়। তিনি কিছু কিছু ব্যায়াম-কৌশল জানিতেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সহিত ভূপেশ বাবুকে ব্যায়াম-কৌশল সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ অনুসারে ব্যায়াম করিয়া ভূপেশ বাবুর শরীর বেশ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, ব্যায়ামের ক্ষেত্রে ভাল উপদেষ্টার প্রভাব ও উপযোগিতা কতখানি।

পূর্ব্বে ফুটবল খেলার দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল—কোন কোনও দিন বেলা ২-৩টার সময়ই তিনি ফুটবল খেলিবার জন্য মাঠে চলিয়া যাইতেন। ঐ ভদ্রলোকের উপদেশে তিনি ফুটবলের উপর ঝোঁক কমাইয়া ব্যায়ামের দিকেই বেশী ঝোঁক দেন। স্কুলের ছেলেদের মাঝে মাঝে যে সকল Sports (খেলা ধূলা) হইত, তাহাতে তিনি আগ্রহের সহিত যোগ দিতেন। ভূপেশ বাবু যখন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন best physique (শরীরের উত্তম অবস্থার) এর জন্য পুরস্কার

পাইয়াছিলেন। ফল কথা, স্কুলে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার শরীর ভাল হইয়া উঠিয়াছিল। স্পোর্টে ও সাঁতারে তিনি প্রথম পুরস্কার পান।

চাঁদপুরের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ভূপেশ বাবু দৌলতপুর কলেজে আই-এসসি পড়িতে যান। সেখানে তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে—শরীর ভয়ানক খারাপ হইয়া যায়। পূজার ছুটিতে চাঁদপুরে যাইয়া তিনি দেখেন, তাঁহাদেরই সহপাঠী ও সহচর একটি ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া খুব শারীরিক উন্নতি করিয়াছে। পূজার ছুটির পর তাই তিনি পিতার অনুমতি লইয়া আই-এসসি পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে সিটি-কলেজের বিখ্যাত ব্যায়াম-শিক্ষক রাজেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। রাজেন বাবুর স্নেহে, যত্নে ও উপদেশে তিন মাসের মধ্যে ভূপেশ বাবুর শরীর ম্যালেরিয়া-রোগমুক্ত হইল। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়ায় তিন মাসের মধ্যেই তিনি ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁহার বাহুবলের পরিচয় দিতে সমর্থ হন। কলিকাতায় আসিয়া ভূপেশবাবু বেশীর ভাগ বারবেল লইয়া ব্যায়াম করিতেন। তখন হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাড়াতাড়ি শরীর সাধন করিতে হইলে বারবেলই সব চেয়ে ভাল ব্যায়াম। রাজেন বাবুর শিষ্য হইবার পর তিনি কেশব সেন, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, চিট টুন, যতীন রায়, গোপাল রায় চৌধুরী প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই শরীর বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তেও ভূপেশবাবুর শরীর-সাধনে বেশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারতীয় ভার-উত্তোলন প্রতিযোগিতায় রাজেন বাবুর চারিজন ছাত্র (তন্মধ্যে ভূপেশও একজন) যোগদান করেন, এবং সেবার সকলেই best physiqueএর প্রাইজ পান। তার

পর ভূপেশ বাবু সেলার্স সার্কাসে যোগ দিয়া দুইখানা চলন্ত মোটরের গতিরোধ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার মত এই যে, শরীরের শক্তি লাভ বিশেষ দরকার বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতিও শিক্ষা করা দরকার। কারণ, মুষ্টিযুদ্ধে শরীরের ক্ষিপ্রকারিতা বৃদ্ধি পায়। আর, মফস্বলে বাস করিতে হইলে লোকের জীবনে সময়ে সময়ে এইরূপ ক্ষিপ্রকারিতা ও শারীরিক বলের বিশেষ প্রয়োজনও আসিয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া ভূপেশবাবু বক্সিং প্রভৃতি শিখিয়াছেন। শরীরে বল থাকিলে শরীরের যে দিকেই চাওয়া যায়, সেই দিকেই উন্নতি করা যায়। তাই শরীরের শক্তি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত—ইহাই ভূপেশ বাবুর পরামর্শ।

ভূপেশ বাবুর দেহের ওজন ১১ ষ্টোন ৬ পাউণ্ড। তাঁহার বাহুবলের পরিচায়ক নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি তিনি করিতে পারেন—(১) পেশী সঙ্কোচন, (২) সিকি ইঞ্চি পুরু সওয়া দুই ইঞ্চি চওড়া লোহার বার তিনি মোচড়াইয়া পাকাইয়া ফেলিতে পারেন, (৩) দুইখানি মোটর থামাইতে পারেন, (৪) Motor accident, (৫) Fatal jump, (৬) Human Bridge ইত্যাদি। ভূপেশবাবু এখন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীমান মণি ধর

ইঁহার কার্য্যপদ্ধতি সম্পূর্ণ নূতন এবং অতি অদ্ভুত। ইঁহার সমগ্র শক্তি ইঁহার কেশরাজিতে কেন্দ্রীভূত।

কামান-বন্দুক আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বের ইতিহাসে পড়া যায়, তখনকার কালের লোকের যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর-ধনু। ইতিহাসে ইহাও পড়া যায় যে, বহিঃশত্রু দেশ আক্রমণ করিলে যুদ্ধ করিতে করিতে ধনুর গুণ বা ছিলার অভাব হইলে মেয়েরা নিজেদের দীর্ঘ কেশ কর্ত্তন করিয়া দিতেন। সেই কেশ বিনাইয়া ছিলা তৈয়ার করিয়া যুদ্ধ করা হইত। ধনুর ছিলা খুব শক্ত না হইলে ধনুতে গুণ দেওয়া বা জ্যা আরোপণ করা যায় না। সেই জন্য তন্তু দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত করিতে হইত—সাধারণ পাট-শন-তূলা প্রভৃতি হইতে ধনুর জ্যা প্রস্তুত করিলে তাহা মজবুত হইত না। আর তন্তু জৈব পদার্থ বলিয়া তাহা অত্যন্ত মজবুত হইত—পুনঃ পুনঃ আকর্ষণেও তাহা শীঘ্র ছিঁড়িত না। ধুনুরীরা এখনও তূলা ধুনিবার ধনুকে তন্তু ব্যবহার করে। কেশগুচ্ছও তন্তুর ন্যায় মজবুত। সেই জন্য পুরাকালে ধনুর ছিলার তন্তুর অভাব হইলে স্ত্রীলোকদিগের কেশরাজির দ্বারা ছিলার কাজ কতকটা হইতে পারিত; সেই কেশের পারিপাট্য সাধন করিয়া মণিবাবু তাঁহার মস্তকের কেশ-রাশিকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন।

মণিবাবু কেমন করিয়া এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় দিই।

শৈশব কাল হইতেই তিনি খুব ঘন কুঞ্চিত কেশরাজির অধিকারী। আর বাল্যকাল হইতেই কেশের পারিপাট্য সাধনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। সেই জন্য তিনি আজকালকার কবি-জাতির মত চুল

শ্রীমান মণি ধর
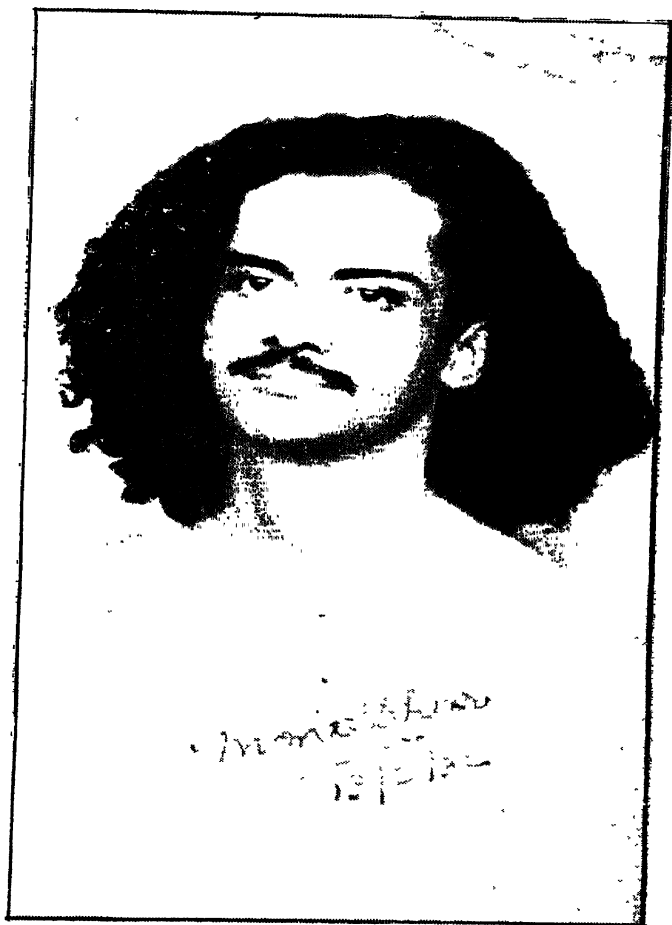
একটু বড় রাখিতে আরম্ভ করেন (যদিও তিনি কবি কি না তাহা আমি জানি না)। চুলগুলি চিরজীবন কেমন করিয়া সুন্দর থাকিবে—ইহাই হইল দিবা-নিশি, শয়নে-স্বপনে তাঁহার প্রধান চিন্তা। কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া তিনি চুলগুলির এমন পারিপাট্য সাধন করিলেন যে, যে দেখিত, সেই তাঁহার চুলের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইত।

ইহার পর তিনি শরীর সাধনে মনোনিবেশ করিলেন—বাবু পুলিন-বিহারী দাসের লাঠি খেলার আখড়ায় ভর্ত্তি হইয়া ছোরা, তরবারি, লাঠিখেলা ও যুযুৎসু অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এক বৎসর পরে এক দিন তাঁহার কি খেয়াল হইল—ক্লাবের অন্য সব লোক চলিয়া গেলে তিনি যখন একা রহিলেন, তখন তাঁহার লম্বা চুলগুলি একটা বারবেলে বাঁধিয়া চুলের শক্তিতে তাহা তুলিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। সেই দিন হইতে চুলের সাহায্যে নূতন রকমের খেলা দেখাইবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল। চর্চ্চা করিতে করিতে তিনি চুলের শক্তি এত বাড়াইয়া ফেলিলেন যে, কেবল মাত্র চুলের সাহায্যে অনেক নূতন ও অদ্ভুত খেলা দেখাইবার শক্তি লাভ করিলেন। জহুরী জহর চেনে। মণিবাবুর গুণপনা দেখিয়া রাজেনবাবু তাঁহাকে দলে টানিয়া নিখিলবঙ্গীয় শরীর-সাধন সমিতির অনারারী সদস্য করিয়া লইলেন।

চুল লইয়া চর্চ্চা করিতে করিতে মণিবাবু চুল সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কি করিয়া চুলের যত্ন করিতে হয়, কেমন করিয়া চুলের শক্তি বাড়ে, চিরদিন চুল কি করিয়া সুন্দর ভাবে বজায় রাখা যায়, টাক পড়ে কেন, চুল উঠা কি করিয়া নিবারণ করা যায়, এই সব বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছে।

মণিবাবুর বয়স এখন ২৭ বৎসর। দেহের ওজন ১ মণ ১৬ সের (৮ ষ্টোন)।

ইনি চুলের দ্বারা ৪০০ পাউণ্ড ওজন তুলিতে পারেন।

দুইজন মানুষ মণিবাবুর দুই দিকে থাকিয়া তাঁহার চুল ধরিয়া ঝুলিতে পারে।

কড়ি কাঠে শক্ত দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়িতে চুল বাঁধিয়া তিনি নিরবলম্ব ভাবে ঝুলিয়া থাকিতে পারেন।

মণিবাবু ট্রাপিজে উঠিয়া মাথা নিম্নাভিমুখ করিয়া থাকেন, আর একজন লোক তাঁহার চুল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকে।

গোরুর গাড়ীতে যতগুলি লোক ধরিতে পারে ততগুলি লোককে গাড়ীতে চড়াইয়া সেই গাড়ী দড়ি দিয়া চুলের সঙ্গে বাঁধিয়া তিনি গাড়ী টানিয়া লইয়া যান।

দড়ি দিয়া চুলের সঙ্গে মোটর গাড়ী বাঁধিয়া দিয়া মোটর চালাইয়া দেওয়া হয়, এবং মণিবাবু সেই গাড়ীর গতিরোধ করেন।

মণিবাবুর দাঁতের জোরও খুব বেশী। কড়ি হইতে দড়ি ঝুলিতে থাকে, আর দাঁতে করিয়া সেই দড়ি কামড়াইয়া মণিবাবু ঝুলিয়া থাকেন।

ট্রাপিজে চড়িয়া মণিবাবু মাথা নীচু করিয়া দেন, আর দাঁতে একটা দড়ি কামড়াইয়া ঝুলাইয়া দেন। একজন মানুষ সেই দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া থাকে।

মণিবাবু নানান জায়গায় এই সব অদ্ভুত খেলা দেখাইয়া দর্শক-দিগকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দিয়াছেন। এ রকম আশ্চর্য্য খেলা এ পর্য্যন্ত আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই—এ বিষয়ে মণিবাবু একমেবাদ্বিতীয়ম্।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ ১৩১০ সালে ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকাল হইতেই এঁর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। বাল্যকাল হইতেই খেলাধূলার মধ্যে "হাডু-ডু" গাঁদি, ফুটবল ও সাঁতার কাটা এঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। স্কুলজীবন যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন ইনি ফুটবল খেলার কতকগুলি বিশেষ অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া উহা ত্যাগ করিয়া শরীর চর্চ্চায় মন দেন। প্রথম অবস্থায় ডন্, বৈঠক, প্যারালালবার ও মুগুর প্রভৃতি আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ শরীর ভাল হইতে থাকে এবং ইনি অন্যান্য নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় মনোযোগ দেন। কলেজে পড়িতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ইনি "বারবেল" নামক যন্ত্র লইয়া ব্যায়াম করিতে থাকেন। এই সময় এঁর শরীর এমন হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় যে সকলেই এঁর মাংসপেশীসমূহ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইত। তখন হইতেই যুবকদের বিশেষভাবে ছাত্রদের ভিতর শারীরিক চর্চ্চার বিস্তারের জন্য ইনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-নাথ গুহ ঠাকুরতা, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, সত্যপদ ভট্টাচার্য্য, ভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার এবং কেশববাবু প্রভৃতি গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটীতে কলিকাতা ও মফঃস্বলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীর চর্চ্চার কৌশল ও ক্রীড়া দেখাইয়া বেড়াইতেন। ইহাতে যুবকেরা উৎসাহভরে ব্যায়াম করিতে লাগিল। এঁদের চেষ্টায় বহু যুবক ও ছাত্র বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছে। চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কলিকাতা, দার্জ্জিলিং এবং অন্যান্য বহু স্থানে ইহাঁরা ব্যায়াম-কৌশল দেখাইয়াছেন ও স্থানীয় যুবকদের জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপন করিয়া

দিয়াছেন। কেশববাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়াকৌশলের মধ্যে মাংসপেশী সঞ্চালন, লোহার পাত হাতে জড়ান, লোহার শিকল ছেঁড়া, নিজের শরীরের উপর দিয়া পর পর দু খানা মোটর চালাইয়া দেওয়া,—রোলার ও হাতী বুকে নেওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি "রয়েল সার্কাসে" একবার খেলা দেখাইতে গিয়া—মাংসপেশী সঞ্চালন, দু ইঞ্চি চওড়া, ¼ ইঞ্চি মোটা ও ৮ ফিট্ লম্বা লোহার পাত হাতে জড়ান, এক-দিকে ধাবমান দু খানা মোটরগাড়ীর একসঙ্গে গতিরোধ করা ও বুকে হাতী নেওয়া প্রভৃতি খেলা দেখান। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একবার নিখিলবঙ্গ হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হয়। সেখানে হিন্দু-মহাসভা শরীর-চর্চ্চার উৎকর্ষের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য ব্যায়াম প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কেশববাবু সেখানকার প্রতিযোগিতায় এক দিকে ধাবমান তিনখানা মোটর গাড়ীর একসঙ্গে গতিরোধ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। লোহার পাত হাতে জড়ানোতেও প্রথম হন এবং শ্রেষ্ঠ শরীরী (best physique) বলিয়াও প্রতিপন্ন হন। উক্ত তিন বিষয়েই প্রথম হইয়া ইনি ৩টী স্বর্ণপদক পুরস্কার পান। কলিকাতায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নিখিলভারতীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) অধিবেশন হয়। তাহাতে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী বিভাগ খোলা হইয়াছিল। কংগ্রেস হইতে আহূত হইয়া ভারতের নানা স্থান হইতে বহু ব্যায়াম-বীর শারীরিক ক্রীড়া-কৌশল দেখাইবার জন্য কলিকাতা আসেন। এর মধ্যে প্রোঃ রামমূর্ত্তির দল, মধ্যপ্রদেশের হনুমান ব্যায়াম-সমিতির দল, এবং পাঞ্জাবের ছোটগামার দলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই নানাপ্রকার আশ্চর্য্যজনক খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই কংগ্রেস-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে "অল বেঙ্গল ফিজিকাল্ কাল্চার এসোসিয়েসনের" পক্ষ হইতে কেশববাবু এবং অন্যান্য আরও অনেকে খেলা দেখান। কেশববাবু

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত

মাংসপেশী সঞ্চালন, লোহার পাত হাতে জড়ান, এবং তিন খানা মোটরের (একখানা ডজ্‌গাড়ী, একখানা সেভ্রোলেট গাড়ী, একখানা ফোর্ড গাড়ী) একসঙ্গে গতিরোধ করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করেন। কংগ্রেস প্রদর্শনীর পর হইতে কেশববাবুর তিনখানা মোটরের গতিরোধ "Indian Record" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কেশববাবু কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক এবং বহু ছেলে তাঁহার শিক্ষাধীনে আছে। কেশববাবুর মত এই যে "সাধারণ খাদ্য খাইয়া রীতিমত ব্যায়াম করিয়া মানুষ সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে এবং সংযমই স্বাস্থ্যের মূল।"

বনমালী ভ্রাতৃমণ্ডলী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুহ ওরফে গোবর বাবুর প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত বনমালী ঘোষ বড় পালোয়ান বলিয়া খুব নাম করিয়াছেন। ইঁহারা কয় ভাইই কুস্তীগীর পালোয়ান। বনমালী বাবুরা জাতিতে পল্লব গোপ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাস ছিল দক্ষিণ অঞ্চলে। ইঁহারা ছয় ভাই। সকলেই পালোয়ান। গোপজাতি চিরদিনই বাহুবলের জন্য প্রসিদ্ধ। সেকালের বাঙ্গালার সামন্ত রাজাদের অনেকেরই বহু গোপসৈন্য ছিল। বনমালী বাবুর পিতা বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন। বনমালী বাবুর বড় ভাই শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ যৌবনে বিলক্ষণ জোয়ান ছিলেন। তিনি গোঁসাই পালোয়ানের পুত্র মঙ্গল পালোয়ানকে অনায়াসে হারাইয়া দিয়াছিলেন। আজকাল সরদা-আইনে বিবাহের বয়স অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পাঠকরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, বনমালী বাবুর পিতার বয়স যখন ১১ বৎসর, তখন ৫ বৎসর-বয়স্কা এক বালিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বনমালী বাবুরা সেই বাল্য-বিবাহেরই ফল।

শ্রীযুক্ত বনমালী ঘোষ

ইনি পিতার তৃতীয় পুত্র। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ গোবর বাবুর আখড়ায় ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন। পূর্ব্বে ইনি প্রত্যহ ১৫০০ ডন এবং ১৫০০ বৈঠক দিতেন; উপস্থিত প্রত্যহ ১০০০ ডন ও ১০০০ বৈঠক দেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইনি গোবর বাবুর সহিত আমেরিকাতে যান এবং সেখানকার নামজাদা কুস্তীগীর পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তী লড়িয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইঁহার বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন তিনি কানপুরে যান। সেখানে দুজন বেশ নামকরা পালোয়ানকে পরাস্ত করেন। তরুণ বাঙ্গালার ইনি যে একজন শ্রেষ্ঠ পালোয়ান তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইঁহাদের দুগ্ধের ব্যবসায় আছে, তাহার তত্ত্বাবধান বনমালী বাবুকেই করিতে হয়। ইঁহার বয়স এখন ৩৪ বৎসর।

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ঘোষ

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ঘোষ মাতা-পিতার চতুর্থ পুত্র। ইংরেজী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি পান। ১৯২৫ এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি All India Weight-lifting Championship পান। ১৯২৫ সালে ইনি Best Physique Medal পান। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসে দাক্ষিণাত্যের বড় জোয়ান মণ্ডলা বক্সের সহিত কুস্তি লড়েন—সমান সমান যায়। ইনি ২ খানি চলন্ত মোটর থামান, বুকে ৪০ মণ পাথর ভাঙ্গেন, বুকের উপর loaded cart ইত্যাদি চালাইয়া প্রায় এক শত স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পান। ইনি একজন নামজাদা sportsman। ইনি মাংসপেশী সঞ্চালনে পারদর্শী এবং একজন বড় দরের ফুটবল প্লেয়ার। ইনি কাষ্টমস্ আপিসে চাকুরী করেন, এবং কাষ্টমস্ দলে খেলেন। ইঁহার বয়স এখন ৩২ বৎসর। ইনি প্রত্যহ ৫০০ ডন ও ৫০০ বৈঠক দেন। ইনিও তরুণ বাংলার প্রণম্য।

বনমালী ভ্রাতৃমণ্ডলী
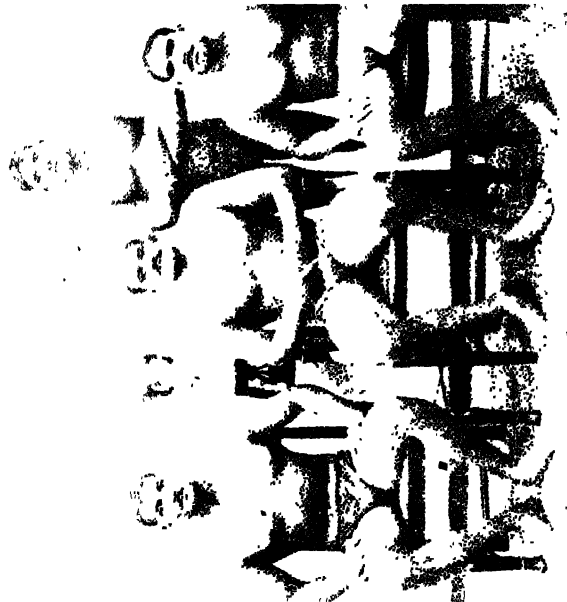
হৃষীকেশ বনমালী নগেন্দ্র প্রকাশ

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ পিতার পঞ্চম পুত্র। ১৯২৭ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এসসি ডিগ্রি পান। ১৯২৫ সালে All India Weight-lifting Competitionএ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ সালে All Bengal Amateur Wrestling Champion হইয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের কংগ্রেসে শোভাবাজার রাজবাটীর পালোয়ানের সঙ্গে সমান কুস্তি লড়িয়াছিলেন। ইঁহার বয়স এখন ৩০ বৎসর। ইনি Aryans Clubএ centre halfএ খেলিতেন। ইনি বাঙ্গালায় একজন বড় ফুটবল প্লেয়ার বলিয়া পরিচিত। ইনি Customs আপিসে চাকুরী করেন। এখন ইনি প্রত্যহ ৫০০ ডন ও ৫০০ বৈঠক করেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইনি পিতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। বয়স ২৬ বৎসর। ইনিও নামকরা কুস্তিগীর। ১৯২৮ সালে চেৎলায় All Bengal Wrestlingএ Champion এবং All Bengal Weight-lifting Champion হন। ১৯২৯ সালের কংগ্রেসে কাল্লু পালোয়ানের শ্রেষ্ঠ সাগ্‌রেদের সঙ্গে সমান কুস্তি লড়েন। ইনিও All India Weight lifting Competitionএ নামিয়াছিলেন। ইনি প্রত্যহ ১০০০ ডন ও ১০০০ বৈঠক দেন। ইনি আজ পর্য্যন্ত প্রায় ২৫টি কুস্তির match লড়িয়াছেন; কিন্তু একটাতেও হারেন নাই। ইঁহারা সকলেই সুবিখ্যাত গোবর বাবুর শিষ্য।

ইঁহাদের দুইটি ভাইপো উপস্থিত কুস্তিতে বেশ তৈয়ার হইতেছেন। একটির নাম শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ ও অপরটির নাম শ্রীপশুপতি ঘোষ।

শ্রীমান নীলমণি দাশ

এবার আমরা আর একটি বীর বাঙ্গালী যুবকের পরিচয় দিব। ইঁহার নাম শ্রীমান নীলমণি দাশ। ইনি বঙ্গবাসী কলেজে পড়েন। ইঁহার বয়স এক্ষণে মাত্র ২১ বৎসর। ইনি বাল্যে এত রোগা ছিলেন যে ইঁহার সঙ্গীরা ইঁহাকে বিদ্রূপ করিত। চিট্ টুন ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষ ইত্যাদির পেশী সঞ্চালন দেখিয়া ইঁহার প্রথমে ব্যায়াম করিতে ইচ্ছা হয়। পরে তিন বৎসর যাবৎ প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া ইনি যেরূপ শারীরিক উন্নতি করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ইঁহার ওজন এক্ষণে ১মণ ৩০ সের। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত লাঠি-শিক্ষক পুলিনবিহারী দাশের সহিত জলপাইগুড়ি গিয়াছিলেন; সেখানে শুধু সম্মুখের চাকা ধরিয়া মোটর আটকান, Motor accident করেন, ২ ইঞ্চি চওড়া লৌহ-পেটি বক্র করেন, এবং Fatal jump, Human Bridge Jijutsu দেখান। ইহা ছাড়া ইঁহার আরও কয়েকটি অদ্ভুত ক্রীড়া যাহা তিনি এক্ষণে দেখাইয়া থাকেন—

১। দন্তের সাহায্যে ১½ ইঞ্চি লৌহ-পাটি বক্র করণ।

২। পেটের উপর দিয়া বোঝাই মোটর চালান।

৩। ঘাড়ের সাহায্যে ২ ইঞ্চি লৌহ-পাটি বক্র করণ।

৪। ⅝ Inch diameter solid Iron Bar triceps ও Forearmএর উপর মারিয়া বক্রকরণ।

৫। ১½ ইঞ্চি মোটা কাঠের উপর শুধু হাতে পেরেক পোঁতা।

৬। গলার জোর দেখাইবার জন্য ইনি একটি অত্যন্ত ভীতি-প্রদ ক্রীড়া দেখান। ইনি চেয়ারে বসিয়া গলায় মোটা দড়ি বাঁধেন। ঐ

শ্রীমান্ নীলমণি দাস

দড়ির দুই দিক চারিজন করিয়া আটজন জোয়ান লোকে টানে। কলিকাতার কোন এক স্থানে যখন তিনি উক্ত ক্রীড়া দেখাইতেছিলেন, তখন পুলিশ হইতে প্রথমে তাঁহাকে উহা দেখাইতে নিষেধ করে; পরে তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে দেওয়া হয়।

উপরি-উক্ত ক্রীড়া সকলের মধ্যে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ক্রীড়াগুলি ইনিই প্রথম দেখান।

কলিকাতায় এবং বাহিরে নানা স্থানে ক্রীড়া দেখাইয়া ইনি কয়েকটি রৌপ্যপদক পাইয়াছেন ও 'Iron Man' এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানী "Iron Man"—খোদিত একটি রৌপ্যপদক তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন। আর রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হইতে যে মেডেল পাইয়াছেন তাহা Best Physiqueএর জন্য।

বাঙ্গালী শিকারী

বাহুবলের আর একটি পরিচয়—শিকার। শিকারেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ নহেন। বঙ্গদেশে পুরাকাল হইতে বহু দক্ষ শিকারীর আবির্ভাব হইয়াছে। বন্দুকের ব্যবহার এদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী শিকারীরা অবশ্য তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করিতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা লাঠি, তরবারি প্রভৃতির সাহায্যে শিকার করিত এবং এখনও করিয়া থাকে।

শিকার অধুনা ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে কেবল ধনী সম্ভ্রান্ত জমিদার-শ্রেণীর লোকরা গজারোহণে বহুমূল্য বন্দুকের সাহায্যে শিকার করিয়া থাকেন। আবার বাঙ্গালায় এমন স্থানও আছে যেখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। সেই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই সকল হিংস্র জন্তুকে একটুও ভয় করে না, এবং মূল্যবান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রের তোয়াক্কা রাখে না। তাহারা তাহাদের সনাতন লাঠির সাহায্যে ইহাদের তাড়াইয়া দিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে বধও করিয়া থাকে। শিকার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ—ধনী জমিদার ও নিম্ন শ্রেণীর লোক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা প্রায়শঃ শিকারে সাহস প্রদর্শন এবং শিকারের আনন্দে বঞ্চিত। অর্থাভাবে তাঁহারা আধুনিক ধরণে শিকারের আয়োজন করিতে পারেন না, এবং ভদ্রশ্রেণীর লোক বলিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের ন্যায় লাঠি

প্রভৃতি সনাতন অস্ত্রের সাহায্যে শিকার করিতে পারেন না। তবে ধনীদের সাহচর্য্যে থাকিয়া মাত্র দুই চারিজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক শিকার যাত্রার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার কয়েক ঘর জমিদার দক্ষ শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় বংশ, পাবনা বা রাজসাহীর চৌধুরী বংশ, মৈমনসিংহের আচার্য্য-চৌধুরী বংশের নাম করা যাইতে পারে।

জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালার অভিজাতবংশীয় শিকারীদের মধ্যে গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় বংশের ৺জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন অগ্রগণ্য।

মিঃ কে. এন. চৌধুরী, বার-এ্যাট-ল "মানসীতে" স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে জ্ঞানদাবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানদাবাবু ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকারী।

সন ১২৭৩ সালের ৬ই বৈশাখ (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ এপ্রেল) জ্ঞানদাপ্রসন্নের জন্ম হয়। নাবালক জমিদার বলিয়া তিনি চারি বৎসর ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনে ছিলেন। হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি আর কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই; তবে বাড়ীতে বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন।

সঙ্গীতে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল; সেইজন্য তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক মহম্মদ খাঁর নিকট 'সুরবাহার' শিক্ষা করিতেন। এদিকে শরীর-চর্চ্চাও সঙ্গে সঙ্গে চলিত। তদ্ব্যতীত, অল্প বয়স হইতেই শিকারে তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। তিনি স্নাইপ এবং বড় বড় অসংখ্য জন্তু

শিকার করিয়াছেন। তাঁহার শিকারে কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ মোটামুটি একটা হিসাব এই—

Royal Bengal Tiger		...	...	150
Leopard	...	...	...	30
মহিষ	...	...	...	৩০
হাতী	...	...	...	৫

ইহা ছাড়া snipe শিকারে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

Snipe অর্থাৎ কাদাখোঁচা শিকার করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, ইহারা যখন উড়ে তখন ইহাদের শিকার (fly-shooting) করিতে হয়। অতএব অতি সুদক্ষ শিকারী ব্যতীত সাধারণ শিকারী ইহাদিগকে তেমন ভাবে শিকার করিতে পারে না। Snipe শিকারে জ্ঞানদাবাবুর দক্ষতার সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের কাছে শতকরা ৭৮।৮০টি Snipeএর নিষ্কৃতি ছিল না।

উপরি-উক্ত তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে, জ্ঞানদাবাবু কি রকম বড় দরের শিকারী ছিলেন। শিকারের পূর্ব্বে, শিকারের সময় এবং শিকারের পরে—বিশেষতঃ এটি যদি তাঁহার প্রথম ব্যাঘ্র-শিকার হয়—শিকারীর মনের ভাব কিরূপ হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞানদাবাবুর নিজের উক্তির সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। জ্ঞানদাবাবু তাঁহার প্রথম ব্যাঘ্রশিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও হতাশ হইয়া পড়িলাম। প্রথম ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়াছি। ব্যাঘ্র যতই হিংস্র হউক, তাহার দেহের সৌন্দর্য্য অতি অপরূপ। সেই ব্যাঘ্র—তাহার নিজের কোটে তাহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় দণ্ডায়মান। সেই বাঘকে প্রথম দর্শন করিলাম, তাহাকে গুলি করিলাম, তাহাকে আহত করিলাম,

স্বর্গীয় জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

তথাপি তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলাম না—সে পলাইয়া গেল। এ যে কত বড় দুঃখ, কতখানি নৈরাশ্য—সাধারণ লোকে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

ইহা প্রথম দিবসের ঘটনা। পরদিন আবার শিকারান্বেষণে যাত্রা। সজ্জিত হস্তীগুলি শিকার-যাত্রার উদ্দেশ্যে উদ্যত পদে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু আমার মনে লেশমাত্র উৎসাহ নাই—ভাগ্য কি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবে? লোকে "ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে।" এই বিদ্রূপাত্মক প্রবচনের অর্থ—বাঘ অতি দুর্লভ-দর্শন জন্তু। শিকার করিতে গিয়া প্রত্যহ এবং প্রত্যেক ঝোপে বাঘ দেখিতে পাওয়া যায় না।

একটা বিশাল বটবৃক্ষতলে তাঁবু পড়িয়াছে—সম্মুখে গারো পর্ব্বত-শ্রেণীর সুমহান্ দৃশ্য। প্রথম অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে সাড়া পড়িয়াছে। সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত। সকলেরই মন উৎসাহে পূর্ণ। বন্ধু ও সহচরগণের উৎসাহ আমারও মনে সংক্রামিত হইল—বন্ধুবরের প্রবোধ বাক্যে পূর্ব্বদিনের নৈরাশ্যজনিত নিরুদ্যম ভাব তিরোহিত হইয়া আমার মনও উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

যাত্রা সুরু হইল। তাঁবু হইতে তিন মাইল দূরে জঙ্গলে শিকারের স্থান—এক ঘণ্টার মধ্যেই হস্তীগুলি সেখানে পৌঁছিয়া গেল। এই জঙ্গলে বাঘ নিশ্চিতই পাওয়া যাইবে এইরূপই আমাদের ধারণা ছিল। জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। মুহূর্ত্ত পরে যেন মনে হইল বাম দিকে কিছু নড়িতেছে, কিন্তু কিছু দেখা গেল না। সামনের জঙ্গলে আমাদের লোকরা এই মাত্র কোলাহল করিয়া শিকারোপযোগী জন্তুদের তাড়াহুড়া করিয়াছিল। এখন সব নিস্তব্ধ। সহসা কোন সাড়া শব্দ না করিয়া একটা বাঘিনী বাম দিক দিয়া কোথা হইতে বাহির হইয়া সামনের বড় জঙ্গলের দিকে ছুটিল। আমরা তৎক্ষণাৎ বাম দিকে মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

মাহুতরা হাতীগুলাকে ব্যাঘ্রীর পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া সারি দিয়া দাঁড় করাইল। ব্যাঘ্রী তৎক্ষণাৎ তাহার বিপদ উপলব্ধি করিয়া আমাকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইল। এরূপ অবস্থায় বাঘ, বিশেষতঃ ব্যাঘ্রী বড় ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়; এবং শিকারীর মাথা ঠিক রাখিয়া সতর্কভাবে থাকিতে হয়; নচেৎ বিপদ অনিবার্য্য। বাঘটা অগ্রসর হইয়া ২৫ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িবামাত্র আমি গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া ব্যাঘ্রী আমাকে আক্রমণ করিবার উদ্যম ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া দৌড়াইল। আমি দ্বিতীয়বার গুলি করিলাম। এই গুলি তাহার পার্শ্বদেশে বিদ্ধ হইল। বাঘিনী দৌড়িয়া সামনের অনতি-উচ্চ ঘাস-বনে প্রবেশ করিল। আমরা তাহার অনুসরণ করিয়া ঘাসবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাঘিনী পড়িয়া আছে। আমি আশা করিলাম, বাঘিনী এইবার আমাকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু সে তাহা না করিয়া লম্ফ দিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল। আমি তৃতীয়বার গুলি করিলাম। গুলিটা তাহার বাম জঙ্ঘায় প্রবেশ করিল, এবং সে তিন পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিল। এই সময়ে আমার দুই বন্ধু আসিয়া পড়িলেন, এবং প্রত্যেকে এক একটি গুলি চালাইলেন। এই-বার বাঘিনীর মৃত্যু হইল। বাঘিনী দৈর্ঘ্যে ছিল ৯ ফিট। প্রথম ব্যাঘ্রটি হস্তচ্যুত হওয়ার দুঃখ এইবার ঘুচিল।

এই যাত্রায় জ্ঞানদাবাবু আরও কয়েকটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২১এ জুলাই জ্ঞানদাবাবু পরলোকে গমন করেন।

যতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানদাপ্রসন্নের পর যতীপ্রসন্নবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনিও মস্ত বড় শিকারী ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তাঁহার জন্ম হয়। এলবার্ট কলেজ হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইঁহার শিকারের সংখ্যা—

Royal Bengal Tigers	...	12
Shamber (large)	...	2
Leopard	...	22

ইহা ছাড়া অন্যান্য জন্তুও আছে।

একবার কার্ত্তিক পূজার ছুটি উপলক্ষে ইনি ও ইঁহার কয়েকটি বন্ধু তাঁহাদের এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাইয়া চণ্ডিল (পুরুলিয়া) নামক জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশিত হয়। নদীর দুই তীরেই পাহাড়ের শ্রেণী—দৃশ্য অতীব সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল, সেই-খানেই শিকার মিলে। নিমন্ত্রণকর্ত্তার চেষ্টায় ও প্রভাবে নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে প্রায় দুই শত লোক সংগৃহীত হইল—ইহারা জঙ্গল ঠেঙ্গাইয়া পশু তাড়াইয়া বাহির করিবে।

উদ্যোগ আয়োজন করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল—সামনে মাত্র দুই তিন ঘণ্টা শিকারের সময়। লোকজন সব মহা কলরব করিতে করিতে জঙ্গল ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। শিকারীরা বন্দুক হস্তে শিকারের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত।

সহসা যতীবাবুর বাম দিকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এক বৃহৎকায় ভল্লুক বাহির হইল। ভল্লুকটা এক ঝোপ হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী

অপর ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিল। উভয় ঝোপের মধ্যে সামান্য একটু অবকাশ। সেইটুকু পার হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে গুলি করা চাই। সময় ও সুযোগ অতি অল্প। যতীবাবু ঝাঁ করিয়া বন্দুক তুলিয়া লইয়া ঘোড়া টিপিলেন। ভল্লুকটা গুলি খাইয়া বিকট গর্জ্জন করিয়া সেইখানে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। যতীবাবু তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার গুলি করিলেন। ভল্লুকটা গড়াইতে গড়াইতে দ্বিতীয় ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল—আর তাহাকে দেখা গেল না। কিন্তু তাহার মরণকালীন বিকট আর্ত্তনাদে বনভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। জঙ্গল ঠেঙ্গানো তখনও শেষ হয় নাই—অন্য জন্তু বাহির হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল; সেইজন্য ভল্লুকের তখনই তখনই অনুসরণ করা সঙ্গত বোধ হইল না।

সহসা দক্ষিণ পার্শ্বে বন্দুকের আওয়াজ হইল। জঙ্গল ঠেঙ্গানো শেষ করিয়া লোকজন সব ফিরিয়া আসিল। যতীবাবুর দক্ষিণে একজন স্থানীয় শিকারী সেকেলে গাদাবন্দুক হস্তে অবস্থিত ছিলেন। একটা চিতাবাঘ তাঁহার দশ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গুলি করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন সুবর্ণ সুযোগ ফস্‌কাইয়া গেল। গুলি বাঘের অঙ্গ স্পর্শ করিল না, সে নিরাপদে জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

তখন আহত ভল্লুকের সন্ধানে যাওয়া স্থির হইল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্য্য; কারণ, ভল্লুক যদি তখনও জীবিত থাকে, তবে সে তাহার মর্ম্মান্তিক শত্রুদের আক্রমণের চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর কোন উপায় ছিল না—আহত শিকারকে পরিত্যাগ করিয়া কোন শিকারীই রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতে পারেন না—ভল্লুকের সন্ধান করাই স্থির হইল। যতীবাবু ও তাঁহার সহযোগী বন্ধুরা বন্দুক হস্তে

সতর্কভাবে চারিদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল। সামনে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ভল্লুকটা তখন মরণ-যন্ত্রণায় একটা গাছের গুঁড়ি কামড়াইতেছিল। যতীবাবুরা অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার এক বন্ধু ২০ গজ দূর হইতে আর একটা গুলি ছাড়িলেন। সেটা তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল—তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল। ভল্লুকটা দৈর্ঘ্যে ৬ ফিট ৯ ইঞ্চি ছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, যতীবাবুর প্রথম গুলিতে ভল্লুকটার নিম্নদেহের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই সে গড়াইতে গড়াইতে ১০০ গজ চলিয়া গিয়াছিল।

যতীবাবু নেপালের উপকণ্ঠে তরাই প্রদেশে হিমালয়ের পাদদেশে আইয়ো নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সদলবলে ঘাসের জঙ্গলে শিকার করিয়াছিলেন। এই যাত্রায় এই শিকারীর দল দুইটি ভালুক, একটি সম্বর ও কয়েকটি হরিণ এবং একটি ব্যাঘ্র শিকার করেন। এই ব্যাঘ্রটিকে তিনি এবং তাঁহার বন্ধু আসাম প্রদেশের প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া রাজা বাহাদুর প্রায় এক সঙ্গে গুলি করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি গুলি ব্যাঘ্রের স্কন্ধে এবং রাজাবাহাদুরের গুলিটি মেরুদণ্ডে বিদ্ধ হইয়াছিল। বাঘটা মদ্দা, দৈর্ঘ্যে ৯ ফিট ৬ ইঞ্চি।

রাজা বাহাদুর অতি দক্ষ শিকারী। তিনি প্রতি বৎসর শিকারের সময়ে দুই মাসে ১৫।২০টি করিয়া বাঘ শিকার করিয়াছেন। এই তরাইয়ের জঙ্গলের শিকারভূমি তাঁহার নিজ বাসগৃহের ন্যায় সুপরিচিত ছিল—কুচবিহারের হিজ হাইনেস মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে তিনি এখানে বহুবার শিকার করিতে গিয়াছিলেন।

যতীবাবুর মৃত্যু হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই।

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী

যতীবাবুর পুরুলিয়ার জঙ্গলের শিকার-সহচর মিঃ কে. চৌধুরীর নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী দেবশর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, of Lincoln Inn, Barrister-at-law, and Advocate, High Court, Calcutta, বন্ধুমহলে মিঃ কে. চৌধুরী নামেই পরিচিত। ইনিও একজন উঁচুদরের শিকারী। Sports in Jheel and Jungle নামে ইঁহার একখানি শিকারের বই আছে। তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী এই বইখানির বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। বাঙ্গালা বইখানির নাম "ঝিলে জঙ্গলে শিকার"।

কুমুদবাবু নাবালক বয়স হইতেই শিকারী। ১৭।১৮ বছর বয়সেই তিনি প্রকাণ্ড এক চিতা বাঘ শিকার করেন। কুমুদবাবু বলেন, শিকার একটা মস্ত বড় বিদ্যা; এবং এই বিদ্যা আয়ত্ত করা প্রচুর সাধনাসাপেক্ষ। শস্ত্রপাণি হইয়া বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া সাধনা করিলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়। কুমুদবাবু শিকার জিনিসটাকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অর্থাৎ শিকার তাঁহার মতে একটা মস্ত বড় বিজ্ঞান। তিনি এ জীবনে চিতা, চিতল (এক জাতীয় হরিণ), সম্বর (আর এক জাতীয় বৃহদাকার হরিণ) ব্যাঘ্র (রয়েল বেঙ্গল টাইগার), ভালুক, বরাহ, বন্য মহিষ (বা ভারতীয় বাইসন—ইহারা অতি দুর্দ্ধর্ষ) প্রভৃতি কত যে শিকার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। শিকার করিতে গিয়া তিনি কতবার প্রাণ-সংশয় বিপদে পড়িয়া দৈব-কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন। শিকারীর বেশে তাঁহার বীরমূর্ত্তিও অতি সুন্দর।

মৈমনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছার আচার্য্য-চৌধুরী বংশ শিকারীর বংশ বলিলেও চলে। ইঁহাদের অনেকেই বড় শিকারী।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর

আচার্য্য চৌধুরী, স্বর্গীয় মহেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বরদা-কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতিবহু বড় শিকারী ছিলেন এবং আছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী "শিকার ও শিকারী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী "ভারতবর্ষে" "অরণ্য-বিহার" নামে তাঁহার শিকার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শিকার সম্বন্ধে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে শিকারীদের বল-বীর্য্য, অসমসাহসিকতা, বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অকুতোভয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। হিংস্র জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অনেক শিকারী কিরূপে বুদ্ধিকৌশলে, দৈবকৃপায় এবং নিজ বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার লোমহর্ষণ চমকপ্রদ বিবরণ গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে।

মৈমনসিংহ অঞ্চলে ছোট ছোট জঙ্গলে অনেক রকম শিকার পাওয়া যায়। তবে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায় না। চিতা, হরিণ, ভল্লুক প্রভৃতি এই জঙ্গলে মিলে। তা ছাড়া, নেপাল—তরাই, এবং আসামের জঙ্গলেও ইঁহারা সময়ে সময়ে শিকার যাত্রা করিয়া থাকেন। সেখানে মধ্যে মধ্যে বাইসন জাতীয় অতি দুর্লভ শিকার মিলে। কখনও কখনও গণ্ডারের দেখাও পাওয়া যায় বলিয়া শুনা যায়।

বগুড়ার নবাব সাহেব স্বর্গীয় আবদুল সোভান চৌধুরীও একজন বড় শিকারী। ইঁহাদের আদি বাসস্থান মৈমনসিংহের অন্তর্গত দেলদুয়ার। ইঁহারা সেখানকার জমিদার। নবাব সাহেব বিবাহ-সূত্রে শ্বশুর-কুলের বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়া বগুড়ার নবাব হইয়াছেন। ইনিও মধ্যে মধ্যে সদলবলে শিকার যাত্রা করিয়া বহু হিংস্র জন্তু শিকার করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলায় মেটিয়ারী গ্রামের জমিদারবংশীয় স্বর্গীয় রামদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন বড় শিকারী ছিলেন। তাঁহার বন্দুক এত বড় ও ভারী ছিল যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা নাড়াচাড়া বা বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। অথচ সেই ভারী বন্দুক কাঁধে করিয়া তিনি অনায়াসে বনে-জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার গায়ে বিলক্ষণ জোর ছিল। তাঁহার বাহুবলের দুই একটা কাহিনী শুনা যায়। একবার দামোদরের বন্যার সময় তাঁহাদের প্রাসাদের নীচেকার ঘরগুলি জলে ডুবিয়া যায়। নীচেকার একটি ঘরে তাঁহাদের গৃহবিগ্রহ— অষ্টধাতুময়ী দেবমূর্ত্তি ছিল। মূর্ত্তির ওজন নয় মণ। জলপ্লাবন হইতে মূর্ত্তিটিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি উহা অনায়াসে কোলে করিয়া এক তল হইতে সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে উঠিয়া একটি নিরাপদ কক্ষে স্থাপন করেন। শুনা যায়, নদীতীরে বা নদীপথে ভ্রমণ করিবার সময় প্রয়োজন হইলে তিনি নৌকা উল্টাইয়া ছাতার ন্যায় মাথার উপর দুই হাতে ধরিয়া থাকিয়া প্রখর রৌদ্র বা প্রচণ্ড বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। ইহা কি সাধারণ বাহুবলের কাজ?

বন্য মহিষ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত জন্তু—বড় একগুঁয়ে। ইহারা বন্দুকের গুলিকে গ্রাহ্য করে না, সহসা ভীতও হয় না। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং ইহারা সদা সতর্ক। অতি সামান্য শব্দে, কিম্বা তাম্রকূটের ধূমের গন্ধে ইহারা শিকারীর আগমন টের পায় এবং শত্রুকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। গুলি খাইয়া একেবারে কাবু না হইয়া পড়া পর্য্যন্ত ইহারা গোঁ-ভরে শিকারীর দিকে ধাবমান হয়। সুতরাং এই শিকার অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইহার পরই বন্যবরাহ উল্লেখযোগ্য। ইহারাও অত্যন্ত একগুঁয়ে। বাঘ, বিশেষতঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার কিরূপ ভয়ানক জন্তু তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বহুদর্শী শিকারীরা বাঘের অপেক্ষা বন্য মহিষ ও বন্য বরাহকে অধিকতর ভয়ানক জীব বিবেচনা করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালী—রণক্ষেত্রে

সেই লক্ষ্মণ সেনের আমল হইতে বাঙ্গালীকে ভীরু, কাপুরুষ করিয়া অঙ্কিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান আমলের বাঙ্গলার ইতিহাসে লেখা হইল, ১৭ জন মাত্র মুসলমান সৈন্য আসিয়া বাঙ্গলা দেশ জয় করিয়া লইল, বাঙ্গলার রাজা লক্ষ্মণ সেন খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করিলেন। আজিও বাঙ্গালীর এই দুর্নাম ঘুচে নাই।

কিন্তু সত্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অন্য রকম। এখানে আমরা সেকালের বাঙ্গালীর বল-বীর্য্য-সাহসের আলোচনা করিতে বসি নাই, কাজেই সেকালের সত্য ইতিহাসের নজীর আজ তুলিব না। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনের উপযুক্ত কি না, সৈনিকোচিত বল-বীর্য্য-সাহস-রণকৌশল তাহার আছে কি না, আজ তাহারই যৎ-কিঞ্চিৎ পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

সে চেষ্টা করিতে গেলে সেকাল ও একালের মাঝখানকার অন্ধকার যুগটার সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিলে চলে না। এই যুগটা বাস্তবিকই অন্ধকার যুগই বটে। কারণ, এই সময়কার বাঙ্গালী শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় তেমন দিতে পারে নাই—হয় ত সে অবসর না পাওয়াই তাহার কারণ। এই সময় বাঙ্গালী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেই তাহার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিল। "লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—তখনকার বাঙ্গালী মাত্র এই শিক্ষা পাইয়াছিল। গোপালের মত সুবোধ, শান্ত ছেলে হওয়াই তাহার গৌরবের বিষয় ছিল; এবং লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া "বাবু" বনিয়া যাওয়া তাহার জীবনের চরম

আকাঙ্ক্ষা ছিল। অন্ধযুগের বাঙ্গালী ছিল তাহার জননীর অঞ্চলের নিধি। কোনরূপ শ্রমসাধ্য বা বিপজ্জনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে তাহার জননী ও জননীস্থানীয়াদিগের নিষেধ ছিল। বাঙ্গালী জননীর সন্তান-বাৎসল্যের তুলনা জগতে মিলে না—তাহার নিন্দাও আমি করিতেছি না। কিন্তু স্নেহেরও মাত্রাধিক্য ভাল নহে—তাহাতে সন্তানের অনিষ্টই হয়। অন্ধযুগের জননীর অতিরিক্ত স্নেহ-বাহুল্যে অনিষ্ট যথেষ্টই হইয়াছিল। সে যুগে যে যত অলস, অকর্ম্মণ্য, পরমুখাপেক্ষী, দুর্ব্বল—জনক-জননীর সে ততই আদরের পাত্র। কিন্তু ইহা ত মানুষের তথা বাঙ্গালী শিশুর স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে না। কাজেই এত স্নেহ-ভালবাসা, আদর-যত্ন সত্ত্বেও দুই একটা ছেলে কেমন দুরন্ত, দুর্দ্দান্ত, ডানপিটে হইয়া উঠিত, এবং বাঙ্গালী জননীর ভীতি ও বিস্ময়োৎপাদন করিয়া এই সব ছেলেই, শান্ত-শিষ্ট-সুবোধ গোপালের অপেক্ষা জগতে একটা-না-একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইত।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন এমনই একজন ডানপিটে ছেলে।

নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে পনেরো মাইল দূরে নাথপুরের বিশ্বাস-বংশে সুরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। শৈশব কাল হইতেই দুঃসাহসিক কর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। মানব-জীবন পরিণত বয়সে কিরূপ দাঁড়াইবে—শৈশবে অনেক সময়ে তাহার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। সুরেশচন্দ্রের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। নেপোলিয়ন বাল্যকালে যেমন দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, সুরেশচন্দ্রের বাল্য-জীবনের ইতিহাসও প্রায় তাহারই অনুরূপ ছিল। নেপোলিয়নের ন্যায় বালক

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

সুরেশ সমবয়স্ক অন্য বালকদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় করিতেন।

একবার কয়েকজন সাহেব শিকারে বহির্গত হইয়া একটি বন্য বরাহকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। শিকারী ও তাঁহাদের কুকুর-গুলির তাড়নায় বরাহ্ প্রাণভয়ে মাঠের উপর দিয়া ছুটিতেছে। বিপরীত দিক হইতে সুরেশ তাঁহার দুইজন বয়স্য সহ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে মৎস্য-শিকার করিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা তাঁহারা বরাহের সামনে পড়িয়া গেলেন। সুরেশ তাঁহার সঙ্গীদের নিরাপদ পথ দেখাইয়া দিয়া পলাইতে বলিয়া স্বয়ং একাকী বরাহের সম্মুখীন হইলেন। অস্ত্রের মধ্যে তাঁহার হাতে একগাছি বেঁকারীর ছিপ। সেই ছিপের বাঁট দিয়া তিনি বরাহের মুখে আঘাত করিতে তাহার গতিরোধ হইল। এমন সময়ে সাহেবরা আসিয়া পড়িলেন, তাঁহাদের কুকুরগুলা চারিদিক হইতে বরাহকে আক্র-মণ করিল। কুকুর দংশনে ও বন্দুকের বাঁটের আঘাতে বরাহ নিহত হইল। সাহেবরা বালকের অসীম সাহস দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিতে লাগিলেন। সেই হইতে সুরেশ স্থানীয় সাহেব মেমদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এইরূপে সেই বাল্য বয়সেই সুরেশ কত যে বিপজ্জনক কার্য্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

সুরেশ একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া মিশনারীদের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সুরেশ পাঠে তেমন মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাহসিকতা, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণের জন্য অধ্যাপকরা তাহাকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। সুরেশের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁহার পিতা সর্ব্বদাই তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়না করিতেন। পিতার কঠোর শাসনে বিরক্ত হইয়া সুরেশ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পাদরীদের কাছে গিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ

করিলেন। ইহার পর পিতৃগৃহে প্রবেশের তাঁহার আর কোন অধিকার রহিল না। তিনি আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া কিছুদিন কলিকাতা, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে কষ্টে কাটাইয়া অবশেষে এক জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের অনুগ্রহে জাহাজে সামান্য একটু চাকুরী পাইয়া বিলাতে গমন করেন।

লণ্ডনে পৌছিয়া সুরেশ কিছুদিন খবরের কাগজ ফেরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করেন। পরে পুরাতন ভারতীয় দ্রব্যের ফেরী করিয়া গ্রামে গামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মুটেগিরিও তিনি কিছু দিন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কর্ম্মেই বেশী দিন নিবিষ্ট থাকিতে পারিতেন না। ইহাই তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব ছিল।

অবশেষে তাঁহার একটি মনের মত কাজ জুটিল। তিনি বাল্যাবধি ব্যায়ামে অভ্যস্ত ছিলেন—ব্যায়াম কোন দিন ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া ছোট এক সার্কাসের অধ্যক্ষ তাঁহাকে একটি চাকুরী দিলেন। সার্কাসে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দুঃখ ঘুচিল, ক্রমে খ্যাতি-প্রতিপত্তিও লাভ হইতে লাগিল।

এই সার্কাসে একটি জার্ম্মাণ বালিকার সহিত সুরেশের প্রণয় জন্মে, কিন্তু বিবাহের সম্ভাবনা না থাকায়, উভয়ে পরামর্শ করিয়া, আর যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রণয় অগ্রসর না হয় সেই উদ্দেশ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন; বালিকা সার্কাস দল ত্যাগ করিয়া স্বদেশে—জার্ম্মাণীতে চলিয়া যায়, সুরেশও সেই সার্কাস ছাড়িয়া দিয়া এক হিংস্র-পশু-বশকারী সাহেবের নিকট চাকুরী গ্রহণ করেন। সাহেবের নাম জামবাক। ইনি পশু বশ করিবার বিদ্যা সুরেশকে দান করেন। এখন হইতে সুরেশের জীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল।

সার্কাস দলের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে সুরেশ হ্যাম-

বার্গ নগরে উপস্থিত হন। সেখানে দৈবক্রমে পূর্ব্বোক্ত জার্ম্মাণ বালিকার সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা পূর্ব্বপ্রণয় ভুলিতে পারেন নাই। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ইহাতে জার্ম্মাণ বালিকার আত্মীয়-স্বজন সুরেশের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার প্রাণবধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া সুরেশ অপর এক সার্কাসে চাকুরি লইয়া মার্কিন দেশে পলাইয়া গেলেন।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থান ঘুরিয়া সুরেশ অবশেষে ব্রাজিলে উপস্থিত হন। সুরেশ নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সার্কাসের খেলা দেখাইতে দেখাইতে সেখানে তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। পরে সার্কাস ত্যাগ করিয়া তত্রত্য সরকারী পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এখানে থাকিতে থাকিতে এক চিকিৎসকের কন্যার সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। এই মহিলা একদিন রহস্যচ্ছলে সুরেশকে সৈনিকবেশে দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। প্রণয়িনীর অভিপ্রায় রহস্যচ্ছলে ব্যক্ত হইলেও তাহাকেই অখণ্ডনীয় আদেশস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সুরেশ কঠোর সৈনিক জীবন অবলম্বন করিলেন। ক্রমে উক্ত মহিলাকে বিবাহ করিয়া তিনি সংসারী হইয়া উঠিলেন।

সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়া সুরেশ প্রথমে কর্পোর্যাল, পরে সার্জ্জেণ্ট, তৎপরে লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে উন্নীত হন। এই পদে কার্য্য করিতে করিতে ব্রাজিলে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হয়। রাজধানীর নিকটস্থ নাথেরয় নামক স্থান শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া সুরেশ নাথেরয়ের পুনরুদ্ধার করেন। সর্ব্বশেষে সুরেশচন্দ্র কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। ব্রাজিলে তাঁহার দু'একটি সন্তান আছেন।

পাঠকরা হয় ত মনে করিবেন, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের বীরত্ব কাহিনী নেহাইৎ দৈবঘটনা—কোনক্রমে একজন বাঙ্গালী সাধারণ বাঙ্গালী-সমাজের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়া দৈবক্রমে বলবীর্য্য প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সে কথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। অন্ধকার যুগে বাঙ্গলার অবস্থা বাস্তবিকই সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল বটে। কিন্তু বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় সে বাঙ্গলা দেশের ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহার স্থলে নূতন বাঙ্গলা দেশ সুনীল কাল-সাগর-গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে—পুরাতন বাঙ্গালী জাতির অস্থিকঙ্কালের উপর (ফিনিক্স পক্ষীর ন্যায়) নবীন বাঙ্গালী জাতি নূতন জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছে।

বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসৈনিক

মনে পড়ে বাল্যকালের কথা। ফরাসডাঙ্গার গোন্দলপাড়ায় আমাদের এক পরমাত্মীয়ের বাড়ী। একদা তাঁহার মুখে শুনিলাম, ফরাসডাঙ্গায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন —ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রজা মাত্রকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। আত্মীয়কে বলিলাম, ইহা ত সুখের কথা—আনন্দের কথা—আশার কথা। আত্মীয় বলিলেন, ফরাসীর প্রজারা তাহা মনে করে না। বলিলাম, তাহা হইলে তাহারা কি করিবে? আত্মীয় বলিলেন, বাঃ! কি করিবে? হুকুম হইয়াছে প্রত্যেক সমর্থ পুরুষকেই সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইবে। বলিলাম, সে ত ভাল কথাই। আত্মীয় বলিলেন—তাহা কেমন করিয়া হইবে? ধর, যে বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে সেও রেহাই পাইবে না। বলিলাম, নাই বা পাইল। ভায়া বলিলেন, সে হয় না। বলিলাম, তা' হলে তোমরা রাজী নও? আত্মীয় —না। আমরা সেই মর্ম্মে প্রতিবাদ করিয়াছি। ফলে সেযাত্রা ফরাস-

ডাঙ্গায় conscription জারি হয় নাই। তবে ডানপিটে ছেলের কোন কালে কোন দেশেই অভাব হয় না—সে সময়ে চন্দননগরেও তাহাদের অভাব ছিল না। তাহারা conscriptionএর প্রস্তাবে নাচিয়া উঠিয়াছিল; এবং প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তাহাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছিল।

তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ভারতেও আহ্বান আসিয়া পৌছিল। তখন এই ফরাসী ভারতের বাঙ্গালী প্রজারাই সর্ব্বাগ্রে সাড়া দিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিনা আহ্বানেই এই ফরাসী ভারতের একজন বাঙ্গালী প্রজা ইংলণ্ডের সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম—যোগেন্দ্রনাথ সেন। বাড়ী—ফরাসডাঙ্গা। তাঁহার পিতার নাম সারদাপ্রসন্ন সেন। যোগেন্দ্রনাথ ফরাসডাঙ্গার ডুপ্লে কলেজ হইতে কলিকাতার সিটি কলেজে পড়িতে আসেন। সিটি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া তিনি শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়া লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানকার বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তড়িৎবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য লীড্‌স্‌ সিটি কর্পোরেশনের বৈদ্যুতিক বিভাগে প্রবেশ করেন। এখানে কর্ম্ম করিতে করিতে ১৯১৪ সালে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ তখন সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হয় এবং তিনি লীড্‌স্‌ সিটি ব্যাটেলিয়ানে যোগদান করেন। নয় মাস শিক্ষা লাভ করিবার পর পাকা পদ পাইয়া উক্ত শিক্ষানবীশ সেনাদল ওয়েষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্ট ভুক্ত হয়। এই দল প্রথমে মিশরে এবং কয়েক মাস পরে ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে রাত্রির যুদ্ধে শত্রুপক্ষের গুলিতে আহত হইয়া ৩৩ বৎসর বয়সে যোগেন্দ্রনাথ নিহত হন।

তাহার পর ফরাসডাঙ্গা হইতে প্রথম বাঙ্গালী সৈনিকরা ইয়োরোপের মহাযুদ্ধে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করেন। এবার ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতামূলক conscription আইন জারি করেন নাই।—১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩০শে তারিখে—যুদ্ধ তখন ঘোর বিক্রমে চলিতেছে—ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট আদেশ প্রচার করিলেন যে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ফরাসী ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রজারা স্বেচ্ছায় সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। পূর্ব্ববারের কন্‌স্ক্রিপসনের প্রস্তাবে চন্দননগর-নিবাসী অনেক লোক সপরিবারে চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশ অধিকারভুক্ত আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। এবার ঠিক তাহার উন্টা ফল হইল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী এই আদেশ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইবামাত্র একে একে বঙ্গীয় যুবকগণ ফরাসডাঙ্গার ম্যারের কাছে সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসমেত ৪৩ খানি আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১২ খানি প্রত্যাহৃত হয়। অবশিষ্ট ৩১ জনের প্রতি ডাক্তারী পরীক্ষার আদেশ হয়। ২৭ জন মাত্র পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। এই সাতাশ জনের মধ্যে পরীক্ষায় ২০ জন সৈনিক হইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। আর বাকী ৭ জনকে বিদায় দেওয়া হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল কুড়িটি বাঙ্গালী যুবক যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থ পণ্ডীচেরীতে যাত্রা করেন। সমগ্র চন্দননগর-বাসী মাল্যচন্দনের অর্ঘ্য দিয়া যুবকগণকে মহাসমারোহে বিদায় দান করেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে সেদিন বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক চন্দননগর ষ্টেশনে বিদায়-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল বাঙ্গলার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হইয়া রহিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী তিন মূর্ত্তিতে যোগদান করিয়াছিলেন ;—

(১) সৈনিক, (২) চিকিৎসক, (৩) Ambulance Corps। যে সকল বাঙ্গালী চিকিৎসকরূপে যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কে. কে. মুখার্জ্জি, আই-এম-এস মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আহত সৈনিকগণের রক্ষাকল্পে অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া "ভিক্টোরিয়া ক্রস" লাভ করেন। যুদ্ধবিভাগে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে—যার-তার ভাগ্যে এই সম্মান লাভ ঘটে না। আরও যে কয়জন বাঙ্গালী V. C. লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্র রায় বিমান চালনায় অদ্ভুত কৃতিত্ব ও অপরিমিত সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি একাকী তিন চারি খানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস করিবার পর শত্রুহস্তে তাঁহার বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও তিনি স্বয়ং নিহত হন।

ক্যাপ্টেন কে. কে. মুখার্জ্জির পূর্ণ নাম শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ সালে মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম-এস পাশ করিয়া তিনি জাহাজে চিকিৎসকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে তিনি হংকং, পিনাং প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়া প্রাচ্য সমুদ্র ও প্রাচ্য দেশীয় বন্দরগুলির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। ইহার পর তিনি চিকিৎসা বিদ্যা আরও ভাল করিয়া শিখিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ১৯০৭ সালে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-আর-সি-পি এবং পর বৎসর নবেম্বরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-পি-এইচ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১০ সালের ৩০শে জানুয়ারী আই-এম-এস পাশ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি ক্যাপ্টেন হন। ১৯১৫ সালের ১৩ই মার্চ্চ তিনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করেন। কুত-এল-আমারায় তিনি জেনারেল টাউনসেণ্ডের বাহিনীর সঙ্গে তুর্কীদের হাতে বন্দী হন।

সাজি

বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে কত যে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কে তাহার সংবাদ রাখে? এই সকল বীরপুরুষের বাহুবলের কাহিনী সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক অবলম্বনবিহীন হইয়া অচিরে বিলুপ্ত হইতে পারে।

আমরা এইরূপ এক বাঙ্গালী বীরপুরুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিলাম। এই বীরপুরুষের নাম—

বৈদ্যনাথ মজুমদার

আমরা এখানে কেবল তাঁহার বাহুবলের কাহিনীটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

কাশ্যপ-গোত্র ক্ষত্রিয়-বর্ণ মজুমদার-বংশের এক শাখা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে, দ্বিতীয় শাখা ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী বনগ্রাম, গড়িহাটা ও সেরপুর গ্রামে, এবং তৃতীয় শাখা শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী বেজুড়া, আঙ্গিউড়া, বরগ, ইটখোলা ও সুরমা গ্রামে অবস্থিত। ময়মনসিংহ শাখার উপাধি চৌধুরী। ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামের স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় আঙ্গিউড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরচন্দ্র মজুমদার বি-এ মহাশয়ের পিতৃষস্রীয়। বৈদ্যনাথ মজুমদার মহাশয় বেজুড়ার মজুমদার বংশীয়। তিনি সাধারণতঃ বেজুড়ার বীর বৈদ্যনাথ মজুমদার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মোগল-শাসনের অবসান ও ইংরেজ-শাসনের অভ্যুদয়ের সন্ধিক্ষণে বেজুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে

সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ ও অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং একাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়সের মধ্যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ইনি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াই লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে আত্ম-নিয়োগ করিলেন এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তাঁহার দেহে এত বল ছিল যে, পাঁচজন লোক যে প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিতে পারিত না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন; ইহা কি সাধারণ জোরের কাজ!

তান্তিয়া ভীলের জীবনীতে দেখা যায় যে, একবার একটা মহিষ ক্ষিপ্ত হইয়া মাঠ দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। চাষারা মাঠে কাজ করিতেছিল। ক্ষেপা মহিষকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রাণ-ভয়ে চারিদিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। তান্তিয়া ভীলও সেই মাঠে কাজ করিতেছিলেন। মহিষ দেখিয়া তিনি কিন্তু পলাইলেন না—কাস্তে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহিষপ্রবরের সম্মুখীন হইলেন। মহিষ তাঁহাকে দেখিয়া আরও রাগিয়া লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার দিকে তাড়া করিয়া আসিল। সে নিকটে আসিবামাত্র তান্তিয়া থপ্ করিয়া তাহার শিং তুইটা ধরিয়া ফেলিয়া তাহার মাথাটা জোরে নীচু করিয়া ধরিলেন। মহিষটা মাথা তুলিতে না পারিয়া তান্তিয়ার চারি দিকে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তান্তিয়াও এক স্থানে দাঁড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ ঘুরিবার পর মহিষটা ক্লান্ত হইয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। তখন, অন্যান্য যে সকল কৃষক তফাতে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিল, তাহারা আগাইয়া আসিয়া লাঠির আঘাতে মহিষাসুরকে বধ করিল।

বৈদ্যনাথের বীরত্বের কাহিনী ইহার অপেক্ষাও অদ্ভুত। তাঁহাদের গ্রাম বেজুড়ার কাছেই রঘুনন্দন পর্ব্বত। সেই পাহাড়ে অনেক হস্তী বাস করে। পুরুষ হাতীরা মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া লোকালয়ে আসিয়া ভয়ঙ্কর উপদ্রব করে। গ্রাম্য লোক সকল তখন ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। আর হাতীটা অনেক গরীবের কুটীর ও ধনবানের ধানের গোলা ভাঙ্গিয়া ধান ছড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া রাখিয়া যায়।

একবার এই রকম একটা মত্ত হস্তী পাহাড় হইতে নামিয়া বেজুড়া গ্রামের কাছে আসিয়া পড়ে। গ্রামের লোকজন ছুটিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বৈদ্যনাথ করিলেন কি, দৌড়িয়া গিয়া হাতীটার শুঁড় এমন সজোরে চাপিয়া ধরিলেন যে, উহার গতি রুদ্ধ হইল, সমস্ত আস্ফালন থামিয়া গেল, আর তাহার অগ্রসর হইবার সামর্থ্য রহিল না। গ্রামবাসীদের তখন সাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই অবসরে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গিয়া হাতীটাকে বধ করিল।

মহিষের ব্যাপারও যে তাঁহার জীবনে ঘটে নাই, তাহা নয়। তবে তান্তিয়া ভীলের মহিষটা ছিল গ্রাম্য, আর বৈদ্যনাথের মহিষটা ছিল বন্য। গ্রাম্য মহিষের চেয়ে বন্য মহিষ আরও অনেক বেশী দুর্দ্দান্ত ও ভয়ঙ্কর। কুমীর, বাঘ, ভালুকও সহসা বন্য মহিষের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইতে সাহস করে না। বৈদ্যনাথ একদিন টের পাইলেন, একটা বুনো মোষ শিং খাড়া করিয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মোষটা প্রায় তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে—আর একটু হইলেই তাঁহার পিঠে শিং বিঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরে আর কি! বৈদ্যনাথ পিছন ফিরিয়া এক লাফ দিয়া মহিষের শিং দুইটা চাপিয়া ধরিলেন। বাছাধনের আর নড়িবার সামর্থ্য

রহিল না। তখন তিনি করিলেন কি—শিং দুইটা জোরে ধরিয়া মহিষটার মাথা নামাইয়া ধরিয়া তাহার নাকে লাথির উপর লাথি মারিতে লাগিলেন। বেচারি আর করে কি—তাহার নাক থেঁতো হইয়া গেল এবং সে সেইখানে দাঁড়াইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

বেজুড়ার মজুমদাররা ছিলেন জমিদার। বৈদ্যনাথ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন—তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতেন—গ্রামে গ্রামে পুকুর কাটাইতেন, গোচর মাঠ এবং সেখানে গবাদি পশুর খাদ্য ও পানীয় জলের সংস্থান করিয়া দিতেন। তিনি যেমন শিষ্টের পালন করিতেন, তেমনি দুষ্টের শাসনও কঠোর হস্তে করিতেন। তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বজ্জাতি করিয়া কাহারও নিস্তার ছিল না।

খাঁটুরা গ্রামে নূরআলি নামে একজন যবন-দস্যু ছিল। সে ক্রমে এমন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাজপথে দস্যুতা করিত। সে দলবল লইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত, পথিকদের দেখিলেই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিত—দস্যু রত্নাকরের modern edition আর কি! তাহার দৌরাত্ম্যে সেই অঞ্চলের লোকসকল ভয় পাইয়া পৈত্রিক ভিটার মায়া কাটাইয়া রঘুনন্দন পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে ও স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পলাইয়া যাইতে লাগিল। এতদঞ্চল প্রজাশূন্য হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে খবর পাইয়া বৈদ্যনাথ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দস্যু-দমনে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, অল্প কাল মধ্যে তিনি দস্যু নূর আলির বংশ ধ্বংস করিয়া তাহার দল ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই অঞ্চলকে নিরাপদ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কত বাঙ্গালী বীর-পুরুষের বাহুবলের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার রামপুরহাট হইতে সাত মাইল পশ্চিমে মলুটি গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল—এখন সাঁওতাল পরগণার সামিল হইয়াছে।

গ্রামের অধিবাসীরা প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ এবং একবংশীয়, এবং ইঁহারাই মলুটির রাজবংশ নামে বিখ্যাত। বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান খিলিজি-বংশীয় দিল্লীর পাঠান বাদশাহ আলাউদ্দীনকে তাঁহার একটি প্রিয় কার্য্য সাধন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি ও বিত্ত অর্জ্জন করিয়া এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরেরা তিন শত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের জমিদার। তবে বংশবৃদ্ধি সহকারে জমিদারী বহুধা বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধি আর নাই—এখন সকলেরই অবস্থা অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “মলুটি-রাজবংশ” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এই রাজবংশের পরিচয় দিয়াছেন। হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃত্তান্ত আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিলাম।

হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই রাজবংশের সন্তান। তিনি দীর্ঘকায়, হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ, কার্ত্তিকেয় তুল্য পরম রূপবান এবং বীর্য্যবান সুপুরুষ ছিলেন।

হরচন্দ্রের জননীর একটি দুগ্ধবতী অতি প্রিয় মহিষী ছিল। সে সময়ে মলুটির চারিদিকে নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। একদিন মহিষরক্ষক রাখাল মহিষীকে বনের ধারে চরাইতে লইয়া গিয়াছিল। মধ্যাহ্নে সে আসিয়া সংবাদ দিল যে, বন হইতে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বাহির হইয়া মহিষীকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। হরচন্দ্রের জননী এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পুত্রকে ডাকিয়া

আদেশ করিলেন যে, মহিষহন্তা বাঘটাকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিয়া না দিলে তিনি অন্ন-জল গ্রহণ করিবেন না। জননীর আদেশে ধনুর্ব্বাণ লইয়া বাঘটাকে জীবিতাবস্থায় ধরিয়া আনিবার জন্য হরচন্দ্র একাকী বাহির হইলেন। অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ অনু-সন্ধানের পর তিনি দেখিতে পাইলেন, বাঘটা একটা ঝোপের মধ্যে মহিষীর বুকের উপর বসিয়া রক্ত পান করিতেছে। ব্যাঘ্রের সন্ধান পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র তাঁহাকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে যেমন শোণিত পান করিতেছিল, তাহাই করিতে লাগিল। হরচন্দ্র অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ—একটিমাত্র তীরের আঘাতেই তিনি বাঘটাকে বধ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহাতে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করা হয় না। তিনি বাঘটাকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাহার মৃত্যু না হয় এমনভাবে লঘুহস্তে তাহার দেহের এক অংশে শর-সন্ধান করিলেন। আহত ব্যাঘ্র মহিষীকে ত্যাগ করিয়া হরচন্দ্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। বাঘটা যেই তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল, অমনি হরচন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে ডান হাত দিয়া তাহার গলা এবং বাম হাত দিয়া তাহার দেহ এমন জাপটাইয়া ধরিলেন যে, বাঘটা একেবারে নড়ন-চড়ন রহিত হইল। এমনি অবস্থায় প্রকাণ্ড বাঘটাকে কাঁধে করিয়া তিনি বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তিনি জননীর আদেশ পালন করিলেন। পথের ও বাড়ীর লোকরা এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভীত, চকিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। হরচন্দ্র কিন্তু নির্ব্বিকার। জননী-সন্নিধানে আসিয়া তিনি মাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, বাঘটাকে জ্যান্ত ধরিয়া আনিয়াছি—এই নাও। বীর-জননী পুত্রকে আদেশ করি-লেন, বাঘটাকে তুমি তুলিয়া ধরিয়া থাক—আমি স্বহস্তে উহার প্রাণবধ করিয়া উহার রক্ত দর্শন করিব। এই বলিয়া তিনি একখানি তীক্ষ্ণধার

ভোজালী বাহির করিয়া আনিয়া স্বহস্তে ব্যাঘ্রের মস্তক ছেদন করিলেন। স্নেহের পুত্তলী সন্তানকে জীবিত অবস্থায় ব্যাঘ্র ধরিয়া আনিতে আদেশ করিতে এইরূপ বীরা জননীরাই পারেন।

জ্যান্ত বাঘ ধরিয়া আনা হরচন্দ্রের বীরত্বের একমাত্র নিদর্শন নহে। আরও আছে। হরচন্দ্র অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি কিছুক্ষণ অশ্বচালনা করিতেন। এক দিন তিনি গ্রামপ্রান্তে বৃহৎ প্রান্তরে অশ্বচালনা করিতেছেন, এমন সময়ে এক ক্ষিপ্ত মহিষ ছুটিয়া তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। ক্ষিপ্ত মহিষ দেখিয়া অশ্ব ভয় পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দৌড়িতে লাগিল। হরচন্দ্র বারবার রাশ টানিয়াও ঘোড়াকে সংযত করিতে পারিলেন না। ঘোড়াটা যে পথ দিয়া ছুটিতেছিল, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ ছিল। তাহার একটা মোটা ডাল পথের উপর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পথটাকে অবরোধ করিয়াছিল। ডালটা মাটী হইতে এক-মানুষ সমানও উঁচু নয়। লোকজন যখন সেই পথ দিয়া যাইত, তখন তাহাদিগকে মাথা নীচু করিয়া যাইতে হইত, নচেৎ ডালে মাথা ঠুকিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। ঘোড়াটা সেই পথ দিয়া বেগে ছুটিতেছে। হরচন্দ্রের অশ্ব, কাজেই সেটা বেশ উঁচু, বলবান, বেগবান হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব। সেই অশ্বের উপর আরোহী স্বয়ং দীর্ঘকায়। কাজেই, বিপদ আসন্ন এবং অনিবার্য্য। অশ্বের সেই শাখা অতিক্রম করিবার সময় হরচন্দ্রের বুকে প্রচণ্ড আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। অশ্বপৃষ্ঠে ঘাড় নীচু করিয়া সেই স্থান কিছুতেই পার হইবার উপায় নাই। পথিকেরা ভয়ে আকুল, তাহারা ভাবিল হরচন্দ্রের এবার আর রক্ষা নাই। দর্শকরা তারস্বরে চীৎকার করিয়া হরচন্দ্রকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। হরচন্দ্র কিন্তু নির্ব্বিকার।

তিনি নিজে যে এই আসন্ন বিপদের কথা জানিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু তথাপি তিনি ঘোড়া হইতে নামিলেন না। ঘোড়াকে অন্য দিকে চালিত করিয়া বিপদ অতিক্রম করিবার চেষ্টাও করিলেন না। ক্রমে ঘোড়া সেই স্থানে আসিয়া পড়িল। ডালটার সন্নিহিত হইবামাত্র হরচন্দ্র দুই হাত বাড়াইয়া ডালটা ধরিয়া ফেলিলেন এবং দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিলেন। অশ্ববরের গতিরোধ হইল, বাছাধনের আর নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য রহিল না। রাশ টানিয়া যাহা হয় নাই, এইবার তাহা হইল। হরচন্দ্র ইচ্ছা করিলে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িতে পারিতেন, এবং ঘোড়া একাকী ছুটিয়া যাইত। কিন্তু তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াও কেন যে তাহা করেন নাই, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া দর্শকরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।

তখনকার দিনে মৃগয়া ভদ্রলোকদিগের সাধারণ ব্যসন ছিল। হরচন্দ্রও প্রায়ই মৃগয়া করিতে যাইতেন। এক দিন অপরাহ্নকালে এইরূপে ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে একাকী কানন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একটা বৃহৎ বৃক্ষতলে চল্লিশ জনেরও অধিক নীচজাতীয় বলশালী ষণ্ডা চেহারার লোক ঢাল, তরবারি, বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা কে, কি উদ্দেশ্যে সেখানে বসিয়া রহিয়াছে, তাহা যে তিনি বুঝিলেন না তাহা নহে। তাহাদের চেহারা, সশস্ত্র অবস্থা ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহারা যে দস্যুদল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি একাকী ছিলেন, তথাপি, নির্ব্বিকার চিত্তে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনোহর রূপ, বীরমূর্ত্তি, গলদেশে যজ্ঞোপবীত দোদুল্যমান—দেখিয়া, বৃক্ষতল হইতে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আসিয়া ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সেকালে দস্যু-তস্করেরও দেব-দ্বিজে ভক্তির অভাব ছিল না। হরচন্দ্র

তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে, এখানে বসিয়া আছ কেন? লোকটি বলিল, আমরা ডাকাত—আজ রাত্রে মলুটির হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ডাকাতি করিব বলিয়া এখানে বসিয়া আছি। হরচন্দ্র মৃদুহাস্তে বলিলেন, সে আশা ত্যাগ কর। মলুটি গ্রামে ডাকাতি করিবার জন্য প্রবেশ করিলে কাহাকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না। সর্দ্দার বলিল, আমরা সন্ধান লইয়া জানিয়াছি, এই গ্রামে তীর-ধনু ভিন্ন অন্য অস্ত্রশস্ত্র কাহারও নাই। আমাদের এই সকল অস্ত্রশস্ত্র দেখিতেছেন? তীর-ধনু মাত্র সম্বল করিয়া কে আমাদিগকে বাধা দিতে সাহস করিবে? আপনার হাতেই ত তীর-ধনু রহিয়াছে—কই, দেখান দেখি আপনার তীর-ধনুর কতখানি শক্তি? এই বলিয়া সর্দ্দার তাহার দৃঢ় চর্ম্মময় ঢালখানির মাঝখানে চূণের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু অঙ্কিত করিয়া চাঁদমারি করিয়া ঢালখানি নিকটবর্ত্তী একটি বৃহৎ বৃক্ষের গুঁড়িতে বাঁধিয়া দিল। হরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধনুতে গুণ দিয়া শর-সন্ধান করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার তীর চূণের বিন্দু, ঢালের চর্ম্ম এবং গাছের গুঁড়ি ভেদ করিয়া কিছু দূরে পতিত হইল। ব্যাপার দেখিয়া দস্যুদল স্তম্ভিত হইয়া গেল! সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ন্যায় তীরন্দাজ এ গ্রামে আর কতগুলি আছে? হরচন্দ্র বলিলেন, আমি ত সামান্য। আমার অপেক্ষা দক্ষ তীরন্দাজ এ গ্রামে শতাধিক আছে। বেগতিক দেখিয়া দস্যুরা হরচন্দ্রকে আবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ডাকাতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রস্থান করিল।

হরচন্দ্র চিরসুস্থ দেহে ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

সার্কাসের ভূমিকা

বাঙ্গালা দেশের পাশ্চাত্য ধরণের ব্যায়াম-চর্চ্চার ইতিহাস লেখা যদি কখনও সম্ভব হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সার্কাস এই ইতিহাসের অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে।

প্রায় চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বের কথা—সরকার বাহাদুর হুকুম দিলেন যে, ইস্কুলের ছেলেদের ব্যায়াম শিখাইতে হইবে। তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ব্যায়াম-চর্চ্চা সুরু হইয়াছিল। যাহাদের লেখাপড়া শিখিবার সম্ভাবনা বেশী ছিল না—পড়াশুনায় অমনোযোগী বলিয়া যারা বাপ-মায়ের কাছে সর্ব্বদা গঞ্জনা খাইত, প্রধানতঃ তাহারাই প্রথমে ব্যায়াম-চর্চ্চায় মনোযোগ দেয়। তাহাদের দেখাদেখি পড়াশুনায় ভাল, মেধাবী যে সকল ছেলে শরীর বাঁধিবার জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চা করিত, বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনরা তাহাদেরও লাঞ্ছনা করিত—কারণ, তখনও জনসাধারণ ব্যায়াম-চর্চ্চার উপকারিতা বুঝিতে পারিত না—ব্যায়াম-চর্চ্চা করা ডানপিটের কাজ বলিয়াই তাহাদের ধারণা ছিল।

ব্যায়াম-চর্চ্চার সেই আদিম সময়ে যাহারা অল্প-স্বল্প ব্যায়াম-কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল,—সরকারের হুকুম প্রচারিত হইবার পর তাহাদের আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। যাহাদিগকে লোকে একেবারে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিতেছিল, তাহারা হঠাৎ বেশ সম্মানের পাত্র হইয়া উঠিল। কারণ, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে সরকারী ইস্কুলগুলিতে ছেলেদের ব্যায়াম-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল। লোকে আগে জানিত, লেখাপড়াই অর্থকরী। এখন লোকে দেখিল,

ব্যায়াম করিয়াও চাকুরী পাওয়া যায়,—মাহিনা পাওয়া যায়—ডানপিটেগিরি করিয়াও টাকা রোজগার করা যায়।

এইরূপে যাঁহারা ব্যায়াম-শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল সিংহ প্রেসিডেন্সী কলেজে, তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রলাল সিংহ হিন্দু ও হেয়ার স্কুলে এবং স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত হুগলী কলেজে নিযুক্ত হন। কলিকাতা, সিমলা, কাঁসারীপাড়া-নিবাসী যোগীন্দ্রনাথ পালও বিখ্যাত জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার ছিলেন।

এই চারিজনকে বাঙ্গালা দেশে সার্কাসের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও হয়। কারণ, ইঁহারাই সর্ব্ব প্রথম কলিকাতায় চাঁদা তুলিয়া সার্কাস সৃষ্টি করেন।

বিদেশ হইতে যে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই সার্কাস জিনিসটি তখনকার কালের বাঙ্গালী তরুণদের অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহার নূতনত্বের মোহ ত ছিলই; অধিকন্তু যাহারা লেখাপড়া শিখিতে না পারিয়া ব্যায়াম-চর্চ্চায় মন দিয়াছিল, ব্যায়াম-কৌশল দেখাইয়া লোকের কাছ হইতে প্রশংসা লাভের এ একটা মস্ত সুযোগ। ইহাতে হাজার হাজার দর্শকের সামনে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করা যায়। এই জন্য সাহেবদের দেশ হইতে যখন সার্কাসের দল আসিয়া এ দেশে খেলা দেখাইতে আরম্ভ করিল, তখন অনেক তরুণই সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। হরিমোহনবাবু, নবগোপালবাবু প্রভৃতির চেষ্টায় নানা স্থানে তখন অনেকগুলি আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। সার্কাসে যে সকল জিমন্যাষ্টিকের খেলা দেখানো হইত, আখড়ায় আখড়ায় তরুণরা সেই সকল খেলা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। কাঁসারিপাড়ায় যোগীন্দ্রনাথ পালের চেষ্টায় ইহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া যুবকদের সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চারিজনে মিলিয়া রাজার বাজারে সার্কাস খুলিলেন। ইহার নাম হইল গ্রেট ইণ্ডিয়ান

সার্কাস। সায়েন্স কলেজ যাঁর টাকায় হইয়াছে সেই মিঃ টি. পালিত, ব্যারিষ্টার, মিঃ বি. এল. গুপ্ত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জি, প্রভৃতির চাঁদায় সার্কাস তৈয়ার হইল। কুচবিহার, বরোদা, পাইকপাড়ার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি এই ব্যাপারে বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এবং চাঁদা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার আগে আমাদের দেশে সার্কাস ছিল না। এই সার্কাস পরে রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন রায়কে বিক্রয় করা হয়।

যোগীন পাল animal trainer বলিয়া তখন খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি তরুণদের মধ্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এই সময়ে এক বিলাতী সার্কাসের দল কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসে। তাহার নাম ছিল Abell's Great World American Circus। Mr. S. O. Abell ছিলেন ইহার মালিক। কিছু দিন পরে তাঁহার সার্কাস ফেল হইয়া যায়। দল ভাঙ্গিয়া গেলে এবেল সাহেব একা এক হোটেলে থাকিতেন। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের দল তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিজেদের দলে টানিয়া লন। ইনি দলটিকে শিক্ষা দিয়া তৈয়ার করিয়া লন। ফলে দলটি শীঘ্রই খুব জাঁকিয়া উঠে। গড়ের মাঠে যখন এই দল তাঁবু খাটাইয়া খেলা দেখাইতে আরম্ভ করেন, তখন আমরা খুব ছেলেমানুষ। দেওয়ালে দেওয়ালে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের বড় বড় প্ল্যাকার্ডে বিজ্ঞাপন বাহির হইত। রাত্রে দলে দলে লোক গিয়া বাঙ্গালী যুবকদের খেলা দেখিয়া আসিত,—তাহাদের মুখে ছোকরাদের প্রশংসা আর ধরিত না। যোগীন পাল ছিলেন গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের মালিক। কিছু দিন কলিকাতায় খেলা দেখাইবার পর তিনি দল লইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হন। তখন মিষ্টার

এবেল গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস ছাড়িয়া দিয়া নিজে এক দল গঠন করিলেন। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বসু, রাজেনবাবু ও যোগেন বাবুর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতা খগেন্দ্রলাল সিংহ প্রভৃতি গ্রেট ইণ্ডিয়ানের কয়েকজন ছোকরা এবেল সাহেবের দলে যোগ দিলেন। এবেল সাহেবের দল যখন বিদেশে খেলা দেখাইতে যান, তখন বাঙ্গালীদের মধ্যে ইঁহারাই সেই সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম বিদেশে যাত্রা করেন; আর ইহাই তাঁহাদের জীবনে সর্ব্ব-প্রথম জাহাজে চড়া। এবেল সাহেব ইহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

মিঃ এবেলের সার্কাসের দল প্রথমে মান্দ্রাজ, পরে শিঙ্গাপুর, পরে যাভায় গমন করে। যাভায় ইঁহারা অনেক দিন ছিলেন। অতঃপর মিঃ এবেল সদলবলে অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যান। খগেন্দ্রলাল সিংহ এবেল সাহেবের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন; কিন্তু ভূতনাথ বাবু কোন কারণে গৃহে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে এবেল সাহেব আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর প্যারিস একজি-বিশন হইতে প্রত্যাগত কৃষ্ণলাল বসাক এবেল সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়া নূতন এক সার্কাস গঠন করেন। প্রথমে এই দলের নাম হয় Abell's Great Eastern Circus। ক্রমে ইহার খুব উন্নতি হওয়াতে ইহার নাম বদলাইয়া নূতন নাম দেওয়া হয় Hippodrome Circus। ভূতনাথ বাবুও এই দলে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতিকে বশ করিয়া খেলা দেখাইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিপোড্রোমে তিনি Wild animals লইয়া খেলা দেখাইতেন।

হিপোড্রোম কিছু দিন কলিকাতায় থাকিবার পর বিদেশ যাত্রা করে। প্রথমে কলম্বো (সিংহল), পরে পিনাং, তাহার পর শিঙ্গাপুর, তার পর

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বসু
(বাঘকে খেলা শিখাইতেছেন)

যাভায় যাওয়া হয়। যাভা হইতে শিঙ্গাপুরে ফিরিয়া এই দল হংকংএ যায়। হংকং হইতে ক্যান্টনে গিয়া খেলা দেখাইয়া দল পুনরায় হংকংএ ফিরিয়া আসে। সেখান হইতে পরে সাংহাই, তাহার পর টিয়েনসিন, তার পর পিকিন, তথা হইতে আবার টিয়েনসিন এবং অবশেষে জাপানে যায়। জাপানে খেলা দেখাইয়া হিপোড্রাম পোর্ট আর্থারে গমন করে। সেখান হইতে হংকং ও সাংহাই হইয়া শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে গমন করে। এই দেশের সকল স্থান ঘুরিয়া আবার ব্যাঙ্কক, হংকং, ডেলহি, সুমাত্রা দেশ ভ্রমণ করিয়া রবার এষ্টেটে খেলা দেখাইয়া ব্রহ্মদেশে আসে। সেখান হইতে কাথা এবং অন্যান্য স্থান ঘুরিয়া হিপোড্রোম কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। কলিকাতার ময়দানে আবার তাঁবু ফেলিয়া অনেক দিন ধরিয়া খেলা দেখানো হয়। তাহার পর আবার কলম্বো এবং সিংহলের চতুর্দ্দিকস্থ দ্বীপগুলি পরিভ্রমণ করে। ইঁহার পর আবার ভারতে ফিরিয়া টুটিকোরিন, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহিস্থর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, পঞ্জাবে পেশোয়ার, কোহাট পর্য্যন্ত যাওয়া হয়। তার পর কাশ্মীরের রাজধানী জম্মুতে গিয়া মহারাজাকে খেলা দেখাইয়া প্রশংসার সহিত প্রচুর অর্থ লাভ করে। মহারাজা স্বয়ং ৪০০০ টাকার কাশ্মীরী শাল আলোয়ান প্রভৃতি খেলাৎ দিয়াছিলেন। এই দল যখন কাশ্মীরে যান, তাহার পর কাশ্মীরে দুইবার রাজ-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে সময় স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাশ্মীরের মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সার্কাসের দলকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে পঞ্জাব, দিল্লী, জব্বলপুর, এলাহাবাদ হইয়া আবার কলিকাতার গড়ের মাঠ।

এই দল প্রতি বৎসর একবার করিয়া ভারত-ভ্রমণে বাহির হইতেন। মহিস্থরে গেলে মহারাজা তাঁহাদের খুব খাতির করিতেন। তিনি প্রচুর

প্রশংসা, উৎসাহ এবং অর্থ সহ প্রতিবারই একটি করিয়া হাতী উপহার দিতেন।

হায়দরাবাদের ভূতপূর্ব্ব নিজাম দিল্লীর দরবার হইতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া মহিসুর হইতে হিপোড্রোমকে নিজ রাজধানীতে ডাকিয়া লন। নিজামের উদ্যানে সার্কাসের তাঁবু পড়ে এবং প্রচুর অর্থ ও সম্মান লাভ হয়।

খগেন্দ্রলাল সিংহ অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তিনি ও ভূতনাথবাবু উভয়ে মিলিয়া পুনরায় যোগীন পালের গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে যোগদান করেন। সে সময়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে খগেন বাবুর ন্যায় সুদক্ষ অশ্বারোহী আর কেহ ছিল না। এমন কি, ভারতে, তথা এশিয়াতেও ছিল না বলিলেও বেশী বলা হয় না। মিঃ এবেলের সার্কাসের দল অষ্ট্রেলিয়ায় থাকিতে মিঃ এবেল খগেন বাবুর পক্ষ হইতে অশ্বারোহণ-নৈপুণ্য বিষয়ে সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াকে challenge করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন অষ্ট্রেলিয়াবাসী এই বিদ্যায় খগেনবাবুকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। খগেন বাবু দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বর্ণ ঠিক সাহেবদের মত ছিল। গোঁপ দাড়ী কামাইয়া মেম সাহেবের পোষাক পরিয়া তিনি যখন ঘোড়ার উপর নাচিতেন, তখন কে বলিবে যে তিনি মেম সাহেব নহেন। সার্কাসের দল যাভায় থাকিতে বাটাভিয়া নগরে বসন্ত রোগে খগেন বাবুর মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়। ভূতনাথ বাবু বাটাভিয়ায় যাইলে তথাকার গবর্ণরের বিশেষ অনুমতি লইয়া গোর হইতে মৃত দেহ তুলিয়া শবদাহ করেন। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া গোরস্থান হইতে মৃতদেহ শবদাহের স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সহরশুদ্ধ লোক প্রায় শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল। সে দেশে শবদাহের প্রথা ছিল না, কেহ কখনও শবদাহ দেখে নাই;

এক্ষণে হিন্দুর শবদাহের প্রথা দেখিবার সুযোগ পাইয়া লোকের কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাই সহর-শুদ্ধ লোক শ্মশান-ঘাটে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

আহিরীটোলা-নিবাসী কৃষ্ণলাল বসাক সার্কাসের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় artist ছিলেন। তিনি হোরাইজেণ্টল বার, juggling, top-spring bar, লাট্টু, flying, trapeze এবং আরও অন্যান্য বহু খেলা দেখাইয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ ক্রীড়ক ত ছিলই না; এমন কি, ইংরেজদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনিই ছিলেন Hippodrome circusএর মালিক। তাঁহার পরিচালনে এই সার্কাস সমস্ত পৃথিবীময় আদৃত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষও বিখ্যাত প্লেয়ার। তিনি পূর্ব্বে শ্যামবাজারে থাকিতেন। এক্ষণে মাণিকতলায় তাঁহার বাগানবাড়ীতে বাস করেন। সেখানে তাঁহার আখড়া আছে। এই আখড়ায় তিনি বহু ছাত্রকে জিমন্যাষ্টিক শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি বিখ্যাত bar-player ও অন্যান্য খেলায় পারদর্শী। তিনি বহুদিন গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে তাঁহার আশ্চর্য্য খেলা দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিজেই সার্কাস খোলেন।

পান্নালাল বর্দ্ধন সার্পেণ্টাইন লেনে থাকিতেন। ইনিও Triple Horizontal Barএর বিখ্যাত প্লেয়ার। ইনি গ্রেট ইণ্ডিয়ান এবং ফিলিপ্স সার্কাসে অনেক দিন কাজ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলাল বসাকের ন্যায় ইনিও প্যারিস একজিবিসনে গিয়াছিলেন। অন্যান্য আরও নানারকম খেলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্যারিস একজিবিসন হইতে খেলায় পারদর্শিতার জন্য ইনি অনেক মেড্যাল পাইয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া

আসিয়া তিনি প্রোফেসর বোসের সার্কাসে যোগদান করেন। কুকুরের দংশনের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাবু ভূতনাথ বসু সার্কাস লাইনে প্রায় ১৫।১৬ বৎসর, এবং একমাত্র এবেল সাহেবের সার্কাসেই দশ বৎসর ছিলেন। সার্কাস দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাকে কত জায়গায় কত যে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। বস্তুতঃ সার্কাসওয়ালাদের জীবনকাহিনী অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অদ্ভুত। ভূতনাথ বাবুর কার্য্যদক্ষতায় এবেল সাহেব তাঁহাকে এমন স্নেহ করিতেন যে, পিনাংএ যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভূতনাথ বাবুকে দান করিয়া যান। ভূতনাথ বাবু এখন অবসর লইয়া কলিকাতায় তাঁহার নিজ বাড়ীতে আছেন।

বনমালী কুণ্ডু—বাড়ী সার্পেণ্টাইন লেনে। ইনি রিংএর চমৎকার খেলা দেখাইতেন। প্রোফেসর বোসের সার্কাসের সঙ্গে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

বিশ্বনাথ শ্রীমানী ছিলেন Juggling player। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে খেলা শিখিয়া ইনি মারাঠি সার্কাসে যোগ দিয়া খেলা দেখাইতেন। জাগ্‌লিং ছাড়া লিপিং বোট, কুসিং বোট প্রভৃতি বিস্ময়কর খেলাও তিনি দেখাইতেন।

পান্নালাল শীল পিরামিড প্লেয়ার ছিলেন। বহু বাজারে ইঁহার বাড়ী। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে অনেক দিন ছিলেন। ক্লাউন (ভাঁড়) সাজিয়া আসিয়া অনেক রঙ্গ তামাসা দেখাইয়া ইনি দর্শকদিগকে খুব হাসাইতে পারিতেন।

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত সার্কাসওয়ালা এবং animal trainer ছিলেন। স্পেনসার সাহেব যখন সর্ব্বপ্রথম বেলুন আনিয়া

গড়ের মাঠে উড়াইতে আরম্ভ করেন, তখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া যায়। সমস্ত সহর ভাঙ্গিয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত হইত। বেলুন আকাশে উড়িলে কলিকাতার সব বাড়ীর ছাদ হইতে দেখা যাইত—মেয়েরা ছাদে উঠিয়া বেলুন দেখিত। একবার গড়ের মাঠ হইতে বেলুন উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কোথায় কোন্ দিকে গেল, আরোহী বাঁচিল কি মরিল—এই ভাবিয়া লোকে উদ্বিগ্ন হইল। যখন উড়ে তখন বেলুনের গতি দক্ষিণ দিকে ছিল। উদ্বেগের প্রধান কারণ যদি বঙ্গোপসাগরে গিয়া নামে তাহা হইলেই ত চিত্তির!

দুই এক দিন গেল। পরে খবর পাওয়া গেল—বেলুন আরোহী সহ নিরাপদে বসিরহাটে নামিয়াছে। খবরের কাগজে ছড়া বাহির হইল—

"উঠ্‌লো বেলুন গড়ের মাঠে,
পড়লো বেলুন বসিরহাটে।"

স্পেনসার সাহেব দশ দশ টাকা করিয়া দর্শনী লইয়া বহু লোককে বেলুনে উঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সর্ব্বপ্রথম বেলুনে উঠিয়া প্যারাসুট লইয়া অবতরণ করিতেন। ইনি পশুদিগকে শিক্ষা দিতে পারিতেন বলিয়া, গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস যখন গঠিত হয় তখন ইনি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি ন্যাশনাল নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল সার্কাসে গমন করেন। ইনি flying trapezeএ খেলা দেখাইতেন।

প্রিয়নাথ বসুর গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে বীর বাদলচাঁদ নামে একটি প্লেয়ার লক্ষ্মী ও নারায়ণ নামক দুইটি বাঘকে শিক্ষিত করিয়া খেলা দেখাইতেন।

সার্কাস অঞ্চলে ক্ষুদিরাম বলিয়া একজন শ্রেষ্ঠ jockey ছিলেন। ঘোড়ার উপর তাঁহার খেলা দেখিবার মত ছিল। তিনি দ্রুত ধাবমান

ঘোড়ার উপর বিনা জিনে ছুটিয়া গিয়া উঠিতেন, তার পর রাশ না ধরিয়া ঘোড়ার উপর নাচিতেন, ঘোড়া ছুটিতে থাকিত।

বিহারী মিত্র জাগ্‌লিংএর ওস্তাদ ছিলেন। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে সার্কাস মহলে নীলমণি নামে একটি লোক ছিলেন। তিনি শোভা-বাজার রাজবাটীর উচ্চ ছাদ হইতে সমারসল্ট মারিয়া অক্ষত দেহে নীচে নামিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডাক নাম ক্ষীরো) মত হাই জাম্প করিতে কেহ পারিত না।

উনিশ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৯-২০ সালে বেণীবাবুর সার্কাসে বাঙ্গালীর মেয়ে প্রমীলাসুন্দরী পুরুষোচিত বলবীর্য্যব্যঞ্জক খেলা দেখাইয়া দর্শকগণকে চমকিত করিয়াছিলেন। তিনি বেণীবাবুর শিষ্যা—বেণীবাবু হাতে ধরিয়া তাঁহাকে সমস্ত খেলা শিখাইয়াছিলেন। বেণীবাবুর সার্কাসের নাম ছিল Acrobats' Circus। যখন এই সার্কাসের অভিনয় হইত, তখন রামমূর্ত্তি সার্কাস লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাম-মূর্ত্তির অনেক খেলা দেখিয়া প্রমীলাসুন্দরী সেগুলিও অভ্যাস করিয়া-ছিলেন। ঘোড়া খুলিয়া একখানি পাল্কী গাড়ী লোক বোঝাই করিয়া প্রমীলাসুন্দরী বর্শার দ্বারা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেন। তিনি চলন্ত মোটর থামাইতেন। ৩০ মণ ওজনের পাথর বুকের উপর ভাঙ্গিতেন। তিন মণ ওজনের কামানের গোলা লইয়া feat দেখাইতেন। তাঁহার বুক ও উরুর উপর দিয়া দুইখানি গরুর গাড়ী চালাইয়া দিতেন। শেষকালে তিনি ময়দানে বোসের সার্কাসে খেলা দেখাইতে আরম্ভ করেন। তিনি গলায় চামড়ার ফিতার দ্বারা ওয়েলার ঘোড়া তুলিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার গুরু বেণীবাবুর সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ ভ্রমণ করিয়া খেলা দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক

সার্কাসের ভিতর দিয়া যাঁহারা বিশ্ববাসীর কাছে বাঙ্গালীর বাহুবল ও ব্যায়াম-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম।

কলিকাতার বসাক বংশ বনিয়াদী বংশ—কলিকাতার গোড়া পত্তন হইতে তাঁহাদের এখানে বাস। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-বিস্তারেও তাঁহারা বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই বংশের ৺শোভারাম বসাক বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ ও ধনী লোক ছিলেন। শোভারাম বসাকের বংশে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২১এ এপ্রেল কৃষ্ণলাল বসাক মহাশয়ের জন্ম হয়।

যথাকালে প্রসিদ্ধ যদুপণ্ডিতের বঙ্গ বিদ্যালয়ে কৃষ্ণলালের বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা খেলাধূলার দিকে তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল। সেই সময়ে তাঁহাদের পাড়ার (আহীরীটোলার) এক বাড়ীতে ৺অখিল চন্দ্রের জিমন্যাষ্টিক হয়। রাত্রি ৯টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত নির্নিমেষ নেত্রে তিনি ঐ খেলা দেখেন, এবং জিমন্যাষ্টিকের ক্রীড়া কৌশল দেখিয়া তাঁহার শিশু-চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। সেইদিন হইতেই তাঁহার মনে সঙ্কল্প জাগে যে, তিনি জিমন্যাষ্টিক শিখিবেন এবং ঠিক ঐরূপ করিতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপন হইয়াছিল। ইহাতে শিশু কৃষ্ণলালের আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আত্মবিশ্বাস মানুষকে জীবনের পথে পরিচালিত করে—ইহাই সিদ্ধিলাভের মূল। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস যাহার নাই—কাজ করিতে উদ্যত হইয়া যে ইতস্ততঃ করে এবং ভাবিতে থাকে, পারিব কি পারিব না—সে জীবনে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

বাড়ী আসিয়া তিনি জিমন্যাষ্টিক শিখিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ পথে বাধাবিঘ্ন বিস্তর। পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ না থাকায় পিতার নিকট তাড়না সহ্য করিতে হইত। উৎসাহ দিবার কেহ ছিল না; আর তখনকার কালে, শরীর-সাধনাও যে আবশ্যক, এই ধারণা কাহারও মনে বড় একটা জন্মে নাই।

কিন্তু বসাক মহাশয় দমিবার পাত্র নহেন। তিনি সকল বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া শরীর-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীতে একটি বড় আবলুস কাঠের রুল ছিল। তাহার এক দিক দেওয়ালে লাগাইয়া, অপর দিক একটা বাঁশের উপর রাখিয়া তাঁহার হরিজেণ্টাল বার তৈয়ার হইল। ইহাতে কতদূর অভ্যাস করা যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া এই ভাবেই অভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরে যদু পণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয় দর্জিপাড়ার দেওয়ান বাটীতে উঠিয়া গেলে, সেখানে জিমন্যাষ্টিক ক্লাশ খোলা হইল, এবং কৃষ্ণবাবু তাহার প্রধান ছাত্র হইলেন। তখন হইতে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল এবং জিমন্যাষ্টিকে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রতি বৎসর পারিতোষিক লাভ করিতে লাগিলেন, এবং জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয়ের স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে তিনি পাঠে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। জিমন্যাষ্টিক শিক্ষার সুযোগ পাইয়া পড়াশুনায়ও তাঁহার মন বসিতে লাগিল।

চারি বৎসর বাঙ্গলা ইস্কুলে পড়িবার পর কৃষ্ণলাল ইংরেজী শিখিবার জন্য ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে (ডাফ সাহেবের কলেজে) গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। এই চারি বৎসরে সোণাগাজীতে অবিনাশচন্দ্র শীলের জিমন্যাষ্টিকের আখড়ায় তিনি হরিজেণ্টাল ও প্যারালাল বারের অনেক খেলা শিখিয়াছিলেন। ডাফ সাহেবের স্কুলের পশ্চাদ্‌ভাগে তখন অখিল

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক

চন্দ্র মহাশয়ের আখড়া চলিতেছিল। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আখড়ায় ভর্ত্তি হইয়া কৃষ্ণলাল আরও অনেক নূতন কসরৎ শিখিয়া লন। দুই বৎসর এখানে শিক্ষা লাভের পর তিনি বেনেটোলায় নিজে একটি আখড়া খুলেন এবং ৮।১০টি উৎসাহী যুবককে শিক্ষা দানে প্রবৃত্ত হন। এখানে রিং, ট্রাপিজ, বার প্রভৃতি জিমন্যাষ্টিকের নানা রকম সরঞ্জাম সংগৃহীত হয়; এবং সকল রকম খেলোয়াড়ই তৈয়ারি হইতে থাকে। আখড়ার নাম দেওয়া হইয়াছিল—Star Acrobatic Co। ৺দুর্গা-পূজার সময় মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ী খেলা দেখাইয়া কৃষ্ণলাল একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণলাল যখন ডাফ সাহেবের স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, তখন হিন্দু স্কুলের জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার ৺রাজেন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় রাজার বাজারে এক সার্কাস খোলেন, এবং অন্যান্য Acrobat ও Gymnastএর সঙ্গে কৃষ্ণলালও ঐ সার্কাস দলে যোগদান করেন।

মাস দুই পরে রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র—রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হরিমোহন রায় এই সার্কাস দলের অধিনায়ক হন এবং তখন হইতে এই দল হরিমোহন রায়ের সার্কাসের দল বলিয়া পরিচিত হয়। সার্কাসের খেলাও তাঁহার বাড়ীতেই হইত। সুবিখ্যাত আবেল সাহেবও এই দলে যোগ দেন, এবং ঘোড়ার খেলা দেখাইতে থাকেন। তিনি রাজেন্দ্রলাল সিংহের পূর্ব্বপরিচিত; সেই সূত্রে তিনি এই সার্কাসে আসেন। পরে বসাক মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি শিক্ষিত ঘোড়া লইয়া খেলা ত দেখাইতেনই; তাহার উপর নূতন ঘোড়াকে শিখাইয়া তৈয়ার করিয়া লইতেন।

আবেল সাহেব মার্কিণ দেশের লোক। ছেলেবেলায় তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া বহু দিন নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া শেষকালে সার্কাসের

দলে যোগ দেন। Sixty-five years of a Showman's Life নামে একখানি চটি বইতে তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

সে সময় Wilson's Circus নামে এক বিলাতি সার্কাসের দল কলিকাতায় আসে। আবেল সাহেব পূর্ব্বে এই সার্কাসে ছিলেন এবং হাতীর খেলা দেখাইতেন। দল ছাড়িয়া তিনি আগেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং থিয়েটারে থিয়েটারে ও অন্যান্য স্থানে তিনি ও আর দুই একজন সাহেব কিছু কিছু খেলা দেখাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিলেন। দল বলিতে তাঁহাদের তখন কিছু ছিল না। উইলসনের সার্কাস কলিকাতায় আসিবার পর আবেল সাহেবের মনে তাঁহাদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সার্কাসের দল গঠন করিবার বাসনা জাগিল।

কৃষ্ণবাবু রাজেন সিংহের দলে থাকিতে সপ্তাহান্তে কিছু কিছু জলপানি পাইতেন। হরিমোহন রায়ের দলে যাইয়া বাঁধা মাসোহারা পাইতে থাকেন। এই সময় হইতে ব্যায়ামচর্চ্চাকেই তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিবার বাসনা তাঁহার মনে উদয় হয়।

ঠিক এমনই যখন তাঁহার মনের অবস্থা, এমন সময় আবেল সাহেব হ্যারিংটন নামক ঐ সার্কাসের অপর একজন সাহেব খেলোয়াড়ের দ্বারা সার্কাস গঠনের সঙ্কল্প কৃষ্ণবাবুর নিকট প্রকাশ করেন। কৃষ্ণবাবু তাহাতে সম্মত হন। স্থির হয়, চট্টগ্রামে গিয়া সার্কাসের দল খোলা হইবে।

যথাসময়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কৃষ্ণলাল হ্যারিংটন সাহেবের সহিত চট্টগ্রামগামী জাহাজে গিয়া চড়িলেন। চট্টগ্রামে যে সার্কাসের দল গড়া হইল, তাহার নাম হইল—Abell Klaer Olmann Circus. Olmann একজন জার্ম্মাণ। খরচপত্র তাঁহার, তিনিই ম্যানেজার।

চট্টগ্রামে ১২ দিন খেলা দেখাইয়া সার্কাস দল জলপথে ব্রহ্মদেশের

দক্ষিণ আকায়াবে যাত্রা করেন। সেখানেও ১২ দিন। তাহার পর বেসিন বন্দরে ৫।৭ দিন। বেসিন হইতে মৌলমিনে গিয়া এক সপ্তাহ। সেখান হইতে রেঙ্গুনে গিয়া তিন সপ্তাহ অবস্থান। রেঙ্গুন হইতে সার্কাস দল পিনাং, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ। যবদ্বীপ হইতে কলিকাতার পথে আবার সিঙ্গাপুর, পিনাং ও রেঙ্গুন। এক বৎসর বিদেশ বাসের পর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া গড়ের মাঠে তাঁবু গাড়িয়া এক মাস খেলা দেখানো হয়।

জানুয়ারী মাসে আবার যাত্রা। এবার সিংহল। সেখানকার কলম্বো, কান্দি প্রভৃতি নগরে তিন মাস খেলা দেখাইয়া সিঙ্গাপুর হইয়া হংকং। তথায় অবস্থিতি এক মাস। তাহার পর সাংহাই বন্দরে এক মাস। ইহার পর নানা স্থানে ঘুরিয়া সার্কাস দল পিকিনে যায়। তথা হইতে রুষ রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশস্থিত ভ্লাডিভষ্টকে রুষদিগকে খেলা দেখাইয়া সার্কাস জাপান হইতে হংকং হইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। ফিলিপাইনে তিন মাস কাটাইয়া সার্কাস দল হংকংএ আসিলে বসাক মহাশয় আবেলের দল ছাড়িয়া একাকী সিঙ্গাপুরে আসেন। সেখানে তিনি উডইয়ার নামক একজন অষ্ট্রেলিয়ানের সার্কাস দলে যোগ দেন। এই সার্কাসে তিনি সাড়ে তিন বৎসর ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষভাগে তিনি হার্মষ্টোন সার্কাসে যোগ দিয়া পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এই যাত্রায় একবার অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণও হয়। ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে হার্মষ্টোন ছাড়িয়া তিনি ওয়ারেন সার্কাসে যোগ দেন। বৎসরাধিক কাল এখানে থাকিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তিন মাস বিশ্রামের পর এলাহাবাদ হইতে প্যারিস প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পান। তখন তিনি এলাহাবাদে গিয়া প্যারিস যাত্রার উদ্যোগ করিতে থাকেন।

এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ভারতীয় শিল্পিগণকে প্যারিস একজিবিসনে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। পণ্ডিত মতিলালের শ্যালক বাহাদুরজী বন্দোবস্তের ভার পাইয়াছিলেন। বসাক মহাশয়, পান্নালাল বর্দ্ধন ও দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এই উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে গমন করেন। প্যারিস যাত্রার জন্য সর্ব্ব রকমের প্রায় ৬০।৭০ জন শিল্পীর সমাবেশ হয়। ইহাদের মধ্যে acrobat, gymnast, বাজীকর, পালোয়ান, যাদুকর, বীণকার, সেতারী, কালোয়াৎ, বাইজী, নর্ত্তকী, সারঙ্গী, তবলচি, মন্দিরাদার, ছিলিমদার, চিলিমচিদার, হিন্দুস্থানী হালুই-কর, মেওয়ার মিঠাইওয়ালা, ময়রা, কুম্ভকার, কাষ্ঠতক্ষক, ভাস্কর, গজদন্ত-চিত্রকর, ক্ষৌরকার, সূচিক, সূপকার, কাশীর নানাপ্রকার বস্ত্রশিল্পী প্রভৃতি সকল রকমের শিল্পী নিজ নিজ যন্ত্রতন্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও তোড়যোড় সহ প্যারিস প্রদর্শনীতে গিয়াছিল। বসাক মহাশয় এই দলের দলপতি বা ম্যানেজার স্বরূপ গমন করেন। ২৯শে এপ্রেল এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া ১৯শে মে তারিখে প্যারিসে পদার্পণ করেন। বসাক মহাশয়ের উপদেশে ভারতীয় শিল্পীরা সকলেই নিজ নিজ ভারতীয় শিল্পীর বৈচিত্র্যময় পোষাকে প্যারিসবাসী ও তৎকালে প্যারিসে সমাগত সমুদয় বিশ্ববাসীকে দর্শন দেন। সে পোষাকে বর্ণের বৈচিত্র্য, ছাঁদের বৈচিত্র্য, পরিধান কৌশলের বৈচিত্র্য, শিরস্ত্রাণের বৈচিত্র্য ছিলই। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাইজী দুইজনের চরণে পাঁয়জোড়, আঙ্গুলে অঙ্গুরী, কেশে ঝাপটা, অঙ্গে ওড়না, পেশোয়াজের চুমকি সলমার ঔজ্জ্বল্য, সোণা রূপা-মতি-মুক্তা-হীরার বিচ্ছুরিত প্রভা সেই প্যারিসের বিশ্ব-বিমোহিনী শোভার মধ্যেও এক অভিনব অনুভূতি সকল দর্শকের মনে জাগাইয়া তুলিয়া বিশ্ববাসীকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিল। ভারতীয় দলের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র ষ্টেশনটি cosmopolitan জনতায় (সকল

দেশের লোকের সমাবেশে) আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই ভারতীয় দল বিশ্ববাসীর মনে যে কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শনীর শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

"তুর দ্যু মন্দ" নামক প্রাসাদে ভারতীয় শিল্পীদের প্রদর্শনীর স্থান হইয়াছিল। "তুর দ্যু মন্দ" মানে ভুবন-ভ্রমণ। বাড়ীটি সার্থকনামা। এই বাড়ীতে প্রত্যেক প্রকার শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র ষ্টল ছিল। এক একটি ষ্টলে এক এক শ্রেণীর ভারতীয় শিল্পী বসিয়া, স্বদেশে যে ভাবে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত, সেখানেও তাহাই করিত। দর্শকরা মনোযোগের সহিত এই সকল কাজ দেখিত।

মল্লভূমিতে ভারতীয় পালোয়ানরা কুস্তির কসরৎ দেখাইত। দর্শকদের মধ্য হইতে একজন ফরাসী যে-কোন লোককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতেন। কোন দিন বা দুই একজন অগ্রসর হইত, এবং পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কোন দিন বা কেহই আসিত না। সেদিন ভারতীয় মল্লগণ আপনা আপনির মধ্যে কুস্তি করিত। পালোয়ানরা ল্যাঙ্গোট, কাচ ও গেঞ্জী পরিয়া কুস্তি করিত। একদিন বিশ্ববিখ্যাত Eugene Sando আসিয়া ভারতীয় পালোয়ানদের সঙ্গে আলাপ করিয়া যান। ভারতীয়গণও একদিন টিকিট কিনিয়া স্যাণ্ডোর ক্রীড়া দেখিয়া আসেন।

ভারতীয় পালোয়ানদের প্রধান ছিল গোলাম। গোলামের সহিত বিখ্যাত সুইস পালোয়ান কোয়ার দ আলির মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা হয়। প্যারীর বিখ্যাত থিয়েটার হিপোড্রোমে মল্লযুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে ৫০০।৬০০ দর্শক। গোলাম যখন আলিকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তখন দর্শকগণের মধ্যে এক ভয়ানক কলরব উঠিল, এবং সকলে লাফাইয়া, ছুটিয়া মল্লভূমির ধারে আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গোলাম কোয়ার দ আলিকে ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং জয়-

পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না, প্রতিশ্রুত ৫০০ পাউণ্ডের পুরস্কারও কেহ পাইল না।

তুর দু মন্দের কেন্দ্রস্থলে ব্যায়াম করিবার স্থান ছিল। সেখানে বসাক মহাশয়, পান্নালাল বর্দ্ধন ও দেবেন্দ্র ঘোষ ট্রিপল হরিজোণ্টাল বারের খেলা ও লাট্টুর খেলা দেখাইতেন।

তিন মাস প্যারিসে থাকিয়া বসাক মহাশয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

ইহার পর তিন মাস না যাইতে যাইতেই কৃষ্ণলাল দলপতি হইয়া আর একটি সার্কাস দল গঠন করিলেন। ৫টি শিক্ষিত টাট্টু ও ২।৩টি শিক্ষিত বানর সহ আবেল সাহেব, ফ্রেড ওয়েষ্ট ও ফ্লোরি ওয়েষ্ট নামক দুই ইংরেজ ভ্রাতা-ভগিনী, নেভেন নামে আরও দুই ইংরেজ দম্পতী, সর্ব্বতোষ বসু নামক উৎসাহী বাঙ্গালী খেলোয়াড়, ভূতনাথ বসু নামক সুকৌশলী হস্তীপক, ফণী ঘোড়সওয়ার প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। দলের নাম দেওয়া হইল Great Eastern Circus। তিন-চার বৎসর পরে এই নাম বদলাইয়া Hippodrome করা হয়। ইহা খুব বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ১৪ বৎসর চলিয়াছিল। ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। পৃথিবীর সকল জাতীয় লোক এই সার্কাসে কাজ করিত। আর পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই সার্কাস খেলা দেখাইয়া গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। আনন্দের কথা এই যে ইহার পরিচালক ছিলেন একজন বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক মহাশয়।

হিপোড্রোম সার্কাসের দল ভাঙ্গিয়া দিয়া অবধি বসাক মহাশয় কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ ঘোষ

বাঙ্গলার লাঠিয়াল

সেকালে বাঙ্গলার লাঠি অতি শক্তির পরিচায়ক ছিল। পূজনীয় বঙ্কিমচন্দ্র "হায় লাঠি!" বলিয়া যে খেদোক্তি করিয়াছিলেন তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। সেকালে বাঙ্গালার ধনবান ও জমিদারদিগের আত্মরক্ষা, স্ত্রী-কন্যা-জননী-ভগিনীগণের সম্ভ্রম রক্ষা এবং জমিদারী, ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য একদল করিয়া লাঠিয়াল থাকিত। দস্যুদিগের দস্যুবৃত্তি করিবার জন্যও লাঠিই ছিল একমাত্র সম্বল। জমিদারদিগের লাঠিয়ালগণের পদবী পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি। এই লাঠির জোরে জমির উপর অধিকার সাব্যস্ত হইত—একের জমি অপরের হস্তান্তর হইত। তখনকার লোক আইন আদালতের বড় তোয়াক্কা রাখিত না—লাঠির সাহায্যে বাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া লইত। সেই জন্য সেকালে প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছিল—"যার লাঠি, তার মাটী।"

সেদিন আর এখন নাই—বাঙ্গলার সেকালের লাঠিয়াল মরিয়া ভূত হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে আবার লাঠির চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ আধুনিক দুই একজন লাঠিবিশারদের পরিচয় দিতেছি।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ

ইনি উলুবেড়িয়ার নতিবপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় বিখ্যাত লাঠিয়াল কাঞ্চন সর্দ্দার তাঁহার পিতার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। অতুলবাবুকে বাল্যকালে ইনিই কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করেন। কাঞ্চন সর্দ্দার তাঁহার সাকরেদদিগকে যখন শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহাকেও সেইখানে বসাইয়া রাখিতেন। সেই সময় হইতেই লাঠি অতুলবাবুর মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে অতুলবাবু কাঞ্চন সর্দ্দারের নিকট বড় লাঠি শিক্ষা করিতে শুরু করেন। কাঞ্চন সর্দ্দারের মৃত্যুর পর গয়া সর্দ্দারের নিকটও কিছুকাল শিক্ষা

করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি পাইকদের সহিত অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করায় তাঁহার নাম লাঠিয়ালদিগের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু তিনি ইহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই। নিজ অর্থ ব্যয়ে শুধু লাঠি শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের বহু জায়গা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে অনুশীলন-সমিতির কলিকাতা শাখাতে ইনি প্রধান লাঠি শিক্ষকরূপে ছিলেন। সেই সময় অতীনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরবাবুকে বিশেষ করিয়া লাঠি খেলা শিখাইতে হইত বলিয়া তিনি তাঁহার বাটীতে থাকিতেন ; এবং পরে যখনই কলিকাতায় আসিতেন, অতীনবাবুর নিকট থাকিতেন। সেই সময় এলাহাবাদে একটী লাঠি প্রতিযোগিতা হয়। তিনি তথায় যাইয়া সকল লাঠিয়ালকে হারাইয়া বিশেষ খ্যাতির সহিত একটী বড় রৌপ্য কাপ পুরস্কার পান। বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে পর্য্যন্তও তিনি লাঠির চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। লাঠির সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা দেওয়া অসম্ভব ; তবে এই অবধি জানিতে পারি যে, তাঁহার নাম শুনিলে অনেক লাঠিয়াল লাঠি ধরিতে সাহস করিত না। শেষ বয়সে অতীনবাবুর সিমলা ব্যায়াম-সমিতিতে এবং কলিকাতার আর আর অনেক সমিতিতে তিনি আচার্য্যরূপে সকলকেই শিক্ষা দিতেন। আজ বাঙ্গালার মধ্যে অন্যূন ৫০০০ লোক তাঁহার শিষ্য। সকলকেই তিনি সমানভাবে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু অমরবাবুকেই তিনি প্রধান শিষ্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। পুলিনবাবু ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বড় লাঠি শিক্ষা করেন। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পায়ে ঘা হইয়া তিনি মারা যান। বড় লাঠি খেলাতে ইনি অদ্বিতীয়। ইঁহার চারি পুত্র বর্ত্তমান—সকলেই লাঠি খেলিতে অল্প-বিস্তর পারদর্শী। তবে কনিষ্ঠ পুত্র বিভূতিই আজও ইহার চর্চ্চা রাখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বসু

ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে শরীর-চর্চ্চার অন্যতম প্রচারক। বাল্যকালেই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতার আদরেই মানুষ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল ; কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর চর্চ্চার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ইঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠে। তদবধি ইনি আজ পর্য্যন্ত শরীর চর্চ্চার বিষয়ে লাগিয়া আছেন। প্রথমে কত স্থানে বহুবার তিনি Gymnastic আখড়া আরম্ভ করেন। তাহাতে সেই সময় অনেক ছেলেই Gymnastic করিয়া উন্নতি করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইনি একটি কুস্তির আখড়ারও পত্তন করেন। ইনি অত্যন্ত ভাল কুস্তি ল'ড়তেও পারিতেন। ইঁহার নিকট অনেক পালোয়ান থাকিত। তবে ইঁহার একটি বিশেষত্ব ছিল যে, ইনি বাঙ্গালীর ছেলে যাহাতে বলবান হয় সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন এবং তাহাদের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ইঁহার কুস্তির গুরু মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী। অতীনবাবু বরাবর সৌখিনভাবেই ইহার চর্চ্চা কয়িয়া আসিয়াছেন। ভীমভবানী ও আর অনেক নামজাদা কুস্তিগীর ইঁহার নিকট মানুষ হইয়াছিল। ইনি যে শুধু কুস্তির চর্চ্চা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নয়। লাঠি ও তলোয়ার ইত্যাদি অনেক খেলা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অনেককে শিক্ষাও দিয়াছিলেন। এইজন্য ইঁহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। অন্যায় অত্যাচারে বাধা দিতে ইঁহাকে অনেক বারই লাঠি ধরিতে হইয়াছিল। নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জীবনের ৫৫ বৎসর কাটাইয়াও তিনি বাঙ্গালী ছেলেদের শরীর চর্চ্চার বিষয় ভুলিতে পারেন নাই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় এই বয়সেও ইঁহাকে হিন্দুর সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য অনেক কিছু করিতে হইয়াছিল। তাহার পরেই ইনি সিমলা ব্যায়াম-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙ্গালী ছেলেদের সৎসাহসী ও বলবান করিয়া তোলাই ইঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইনিই সিমলা ব্যায়াম-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে লাঠি চর্চ্চার সূত্রপাত করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটীকে তিনি একটী শরীর চর্চ্চার আদর্শ প্রতিষ্ঠান করিয়া তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানটী চালাইতে ইনি সাধারণের নিকট হইতে কোন অর্থ সাহায্য লন নাই। আজ ইঁহার ৬৪ বৎসর বয়স হইলেও ইনি যুবক।

শবীর চর্চ্চার বিষয়ে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় পুঁথি হয় তাহার চেষ্টাও ইনি করিতেছেন। ইঁগাব ৪র্থ পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসুকে কুস্তি বিষয় "ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা" নামক একটী ও অন্য পুঁথি রচনা করিতে উৎসাহিত কবিতেছেন। ইঁহার ৫টী পুত্র সন্তান। ইঁহারা সকলেই পিতার উৎসাহে ও যত্নে লাঠি, তলোয়ার, কুস্তি, যুযুৎসু, বক্সিং প্রভৃতি শরীর-চর্চ্চাতে সকলেই পারদর্শী।

শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ বসু

ইনি অতীন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার আগ্রহে ও যত্নে ইনিও বাল্যকাল হইতেই শরীরচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ইনি পিতার বাল্যবন্ধু ৺কানাইলাল পাঠকের নিকট কুস্তি শিক্ষা করেন। সেই সময় হইতেই ইনি বাংলার অদ্বিতীয় লাঠিয়াল ৺অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট লাঠি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অতুলবাবুব শিষ্যদিগেব মধ্যে ইনিই যে শ্রেষ্ঠ তাঁহার গুরুর শ্রীমুখেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছিল।

মীর্জ্জাপুর পার্কে একটী স্বদেশী মেলা হইতেছে। সেই উপলক্ষে লাঠী ইত্যাদি ব্যায়াম প্রদর্শিত হইতেছে। সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অনেক কিছু ব্যায়ামের কৌশল দেখাইবার পর সকলেই অমর

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু

বাবুকে লাঠী খেলিতে অনুরোধ করিলেন। সে সময় অমর বাবু অনেক দিন লাঠী খেলা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ও সাধারণের অনুরোধে এবং গুরুর হুকুমে তিনি লাঠী খেলিতে বাধ্য হইলেন। কমলচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার খেলা হইয়াছিল। কমলবাবু বেশ ভাল লাঠী খেলিতে পারেন এবং সে সময় তিনি ইহার চর্চ্চাও রাখিয়াছিলেন। খেলা হইতে হইতে অমরবাবু ৩।৪ মিনিটের মধ্যে কমলবাবুর হাত হইতে কৌশলের দ্বাবা লাঠীটি কাড়িয়া লন। সেই দিন প্রকাশ্য সভায় অমরবাবু তাঁহার লাঠী শিক্ষার পরিচয় দিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতাতে অমর বাবুর উদাহরণ দিয়া বাঙ্গালার যুবককে অনেক কথা বলেন। পরে অতুলবাবু উঠিয়া বলেন, "অমব যথার্থই আমার সম্মান বজায় রাখিয়াছে। আজ যে কৌশলের সহিত অমর লাঠী খেলিল, আমার সব শিষ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও সেরূপ আয়ত্ত করিতে দেখি নাই। আমার শিক্ষা দেওয়া যে সার্থক হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। আজ আমি এই সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছি—আমার শিষ্যদিগেব মধ্যে অমরই শ্রেষ্ঠ।" অমরবাবু অর্জ্জুনের ন্যায় শিক্ষার পরীক্ষা দিয়াই শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। কমলবাবু পরে অমরবাবুব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও ভাল লাঠিয়াল। অমরবাবুর ও অতীনবাবুর তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

অতীনবাবুর সিমলা ব্যায়াম-সমিতিতে ৺অতুলবাবু প্রধান শিক্ষকরূপে ও অমরবাবু তাঁহার সহকারীরূপে লাঠি শিক্ষা দিতেন। ৺অতুলবাবুর মৃত্যুর পর ইনিই সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রধান আচার্য্য পদ পান। আজ বাঙ্গলা দেশের অন্যূন ৪ হাজার যুবক ইঁহার শিষ্য। উপস্থিত বড় লাঠিতে ইনিই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস

ইনি লাঠি খেলায় একজন মস্ত বড় ওস্তাদ—ছোট লাঠিতেই ইঁহার হাত বেশী খেলে। ইনি অতি মহাশয় লোক এবং অতি সবল; বেশভূষা, চাল-চলন অতি সাদাসিধা; অথচ ধুকড়ীর ভিতব খাসা চাল—লাঠিখেলায় এমন ওস্তাদ নব্য বঙ্গে বেশী নাই। কেবল কি লাঠি খেলা? তরবারি, ছোবা, যুযুৎসু খেলাতেও তিনি সমান ওস্তাদ।

প্রথমে তিনি সাধারণ একজন লাঠিয়ালের নিকট সেকেলে ধরণের লাঠি খেলা শিক্ষা কবেন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি প্রোফেসার মার্ত্তাজার নিকট অধ্যবসায় সহকারে লাঠি খেলা শিক্ষা করেন। ক্রমে তিনি লাঠিখেলাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি লাঠিখেলার এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহাব "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা" নামক পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি অতি বিনয়ী ও আত্মপ্রশংসা-বিমুখ—নিজেকে জাহির করিতে নিতান্তই নারাজ। তথাপি তাঁহার গুণপনা সমস্ত ভাবতে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার জীবনের কথা, কৃতিত্বেব কাহিনী বলিতে চান না; সেজন্য এবার তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস